কাকাবাবু সমগ্র

কাকাবাবু বনাম চোরাশিকারি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com
2021

সূচিপত্র

১. ঝিঁঝির ডাক.....2
২. তেজপুর শহরের একটু বাইরে.....12
৩. বিকেলের দিকে বাতাস.....31
৪. মিহিমুখ নামে একটা জায়গা.....43
৫. বাংলোর দুখানা ঘরের মধ্যে.....55
৬. রাত্তিরবেলা ঘরে যে-কোনও শব্দ.....65
৭. বুকের মাঝখানে আর ঘাড়ের কাছে.....78
৮. তেজপুর থেকে শিলচরে.....89
৯. গভীর জঙ্গলে বড় ঝিলটার কাছে.....108
১০. বড়ঠাকুরের গাড়ি খারাপ 123

১. ঝিঁঝির ডাক

এমন ঝিঁঝির ডাক যে, কানে যেন তালা লেগে যায়। রাত্তিরবেলার জঙ্গল। খুব নিস্তব্ধ হয় বলেই তো সবাই জানে। কিন্তু রাত্তিরেও যে জঙ্গলের কোথাও-কোথাও এত ঝিঁঝি ডাকে, তা সন্তুর জানা ছিল না।

জঙ্গল একেবারে মিশমিশে অন্ধকারও নয়। আকাশে একটু-একটু জ্যোৎস্না আছে। মাঝে-মাঝে পাতলা সাদা মেঘ ঢেকে দিচ্ছে চাঁদ, আবার পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। কাছে-দূরে ঝিকমিক করে জ্বলছে অজস্র জোনাকি। ঝিঁঝিগুলো অবিরাম শব্দ করে যায়, অথচ তাদের দেখা যায় না। আর জোনাকিগুলো আলো দেখায় কিন্তু কোনও শব্দ করে না।

একটা জিপ গাড়ির সামনের দিকে বসে আছেন কাকাবাবু আর রাজ সিং, পেছন দিকে জোজো আর সন্তু। কেউ নড়াচড়া করছে না একটুও। এইভাবে কেটে গেছে দেড় ঘণ্টা। শীতের রাত, মাঝে-মাঝে শিরশিরে হাওয়া দিলে বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

একসময় রাজ সিং কোটের পকেট থেকে একটা চুরুট বের করলেন। তারপর ফস করে একটা দেশলাই জ্বেলে ধরালেন সেটা।

কাকাবাবু পাশ ফিরে তীব্র চাপা গলায় বললেন, চুরুট ধরিয়েছেন? ছিঃ, আপনার লজ্জা করে না? ফেলে দিন এক্ষুনি!

রাজ সিং চুরুটে দুটো টানও দিতে পারেননি, কাকাবাবুর ধমক খেয়ে ঘাবড়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি সেটা জুতোর তলায় পিষে নিভিয়ে দিয়ে, ফেলে দিলেন বাইরে।

কাকাবাবু বললেন, দেখুন, সামনে এক জায়গায় পাশাপাশি দুটো আলোর বিন্দু দেখা যাচ্ছে। ও দুটোও জোনাকি, না কোনও জানোয়ারের চোখ?

রাজ সিং বললেন, জোনাকি নয়, পিট-পিট করছে না, স্থির হয়ে আছে। তবে, বেশ নীচের দিকে। ছোট জানোয়ার। মনে হয়, খরগোশ!

কাকাবাবু বললেন, পেছন দিকে আরও দুটো চোখ। একজোড়া খরগোশ। ওই যে লাফাচ্ছে!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই চোখ দুটোও মিলিয়ে গেল। আবার অন্ধকার।

কাকাবাবু হঠাৎ রাজ সিংয়ের কাঁধ ছুঁয়ে বললেন, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।

রাজ সিং অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, সে কী? কেন?

কাকাবাবু অনুতপ্ত গলায় বললেন, আপনি চুরুট ধরিয়েছিলেন বলে আমি ধমকালাম। সেটা আমার উচিত হয়নি। আমি তো আপনার বস নই। আপনি আমার অধীনে চাকরি করেন না। আমি একজন সাধারণ মানুষ!

রাজ সিং বললেন, তাতে কী হয়েছে, আমি কিছু মনে করিনি। আপনি আমার চেয়ে বয়েসে বড়।

কাকাবাবু বললেন, ব্যাপারটা কী জানেন? একসময় আমার নিজেরই খুব চুরুটের নেশা ছিল। হাতে সবসময় জ্বলন্ত চুরুট থাকত। এখন ধূমপান একেবারে ছেড়ে দিয়েছি। গন্ধও সহ্য করতে পারি না। এখন কাছাকাছি কেউ সিগারেট বা চুরুট ধরালে আমার রাগ হয়ে যায়।

রাজ সিং বললেন, আমিও চুরুট টানা ছেড়ে দেব ভাবছি। বড় বাজে নেশা।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, চেষ্টা করুন ছেড়ে দিতে!

পেছন থেকে জোজো বলল, কাকাবাবু, আমি একটা কথা বলব?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, কী বলবে, বলো!

জোজো বলল, কী বলব, মানে, যে-কোনও একটা কথা। অনেকক্ষণ কথা বললে আমার পেটের মধ্যে সুড়সুড়ি লাগে।

সন্তু বলল, এতেই তো তোর দুটো সেনটেন্স বলা হয়ে গেল, জোজো!

কাকাবাবু হাত তুলে বললেন, চুপ!

জঙ্গলের মধ্যে এবার শব্দ শোনা যাচ্ছে। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে আসছে কেউ। যেন মানুষেরই মতন কেউ। খোঁড়া মানুষেরা যেমন পা টেনে-টেনে হাঁটে, শব্দটা অনেকটা সেরকম।

কাকাবাবু পাশ থেকে রাইফেলটা তুলে নিলেন হাতে। রাজ সিংয়ের কাছে একটা চার ব্যাটারির মস্ত বড় টর্চ। তা ছাড়া জিপের ওপরেও একটা সার্চলাইট লাগানো আছে।

এই জায়গাটায় জঙ্গল খুব ঘন। কোনও রকম পথের চিহ্ন নেই। এত ঝোপঝাড় যে, এর মধ্যে গাড়ি চালানোও প্রায় অসম্ভব! তবু জিপ গাড়িটা কী করে এলো, সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার! কাকাবাবুই জোর করে রাজ সিংকে নিয়ে এসেছেন। আসবার সময় ধারালো টাঙ্গি দিয়ে মাঝে-মাঝে দু-একটা গাছ কেটে ফেলতে হয়েছে।

কাছেই একটা জলাশয়। ইচ্ছে করেই জিপটাকে জলাশয়ের একেবারে ধারে নিয়ে যাওয়া হয়নি। একটা ঝাঁকড়া গাছের ডালপালার আড়ালে জিপটা লুকিয়ে রয়েছে।

আওয়াজটা খানিক দূর দিয়ে গিয়ে মিলিয়ে গেল এক সময়। রাজ সিং কান খাড়া করে শুনে ফিসফিসিয়ে বললেন, মানুষ নয়, মনে হচ্ছে ভালুক। ভালুকরা শুকনো পাতা ঠেলতে-ঠেলতে যায়।

কাকাবাবু বললেন, হরিণ দেখা যাচ্ছে না কেন? জলের কাছে হরিণ তো খুব আসে দল বেঁধে!

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, কাছাকাছি বাঘ আছে। আমি গন্ধ পাচ্ছি।

কাকাবাবু দু-তিন বার জোরে-জোরে শ্বাস টেনে বললেন, কই, আমি তো কোনও গন্ধ পাচ্ছি না!

জোজো বলল, বাঘ থাকলে হরিণ আসে না। রাজ সিং বললেন, হরিণরা সাধারণত আসে সন্ধের একটু আগে কিংবা ভোরের দিকে। মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি কি এখানে সারারাত থাকার প্ল্যান করছেন?

কাকাবাবু বললেন, কেন, আপনার ঘুম পাচ্ছে নাকি? এখন মোটে সাড়ে বারোটা।

রাজ সিং বললেন, এটা জঙ্গলের কোর এরিয়া। এখানে অনেক রকম জন্তু-জানোয়ার আসে। হঠাৎ হাতির পাল এসে গেলে খুব বিপদ হতে পারে।

জোজো বলল, বাঘ এলে বুঝি বিপদ হবে না?

রাজ সিং বললেন, আমরা জিপগাড়িতে বসে আছি, বাঘ আমাদের দেখতে পেলেও হঠাৎ আক্রমণ করবে না। অসমের বাঘ তো মানুষখেকো নয়, নিজে থেকে প্রথমেই মানুষকে আক্রমণ করতে আসে না। গণ্ডার এলেও বিপদ নেই। গণ্ডার কোনও কিছু ভুক্ষেপ করে না। ভালুকও কাছ ঘেঁষবে না। কিন্তু হাতিকে বিশ্বাস নেই। জিপটা দেখে হাতির হয়তো লোফালুফি খেলার ইচ্ছে হতে পারে। গত বছরে একজন ফরেস্ট রেঞ্জারের জিপ গাড়ি উলটে দিয়ে একপাল হাতি তাঁকে পা দিয়ে পিষে মেরেছিল!

কাকাবাবু বললেন, কেন যেন হাতি সম্পর্কে আমার কোনও ভয় হয় না। হাতি দেখলেই মনে হয়, কেমন যেন আপনভোলা ভালমানুষ গোছের প্রাণী।

রাজ সিং বললেন, দেখলে ওরকম মনে হয় বটে, কিন্তু এক-এক সময় হাতি খুব হিংস্র হতে পারে। বিশেষত কোনও দলছাড়া একলা হাতি সবসময় রেগে থাকে।

কাকাবাবু বললেন, হাতি অত বড় প্রাণী, চুপিচুপি তো আসতে পারবে না। আমরা যদি জেগে থাকি, ডালপালা ভাঙার মড়মড় শব্দ শুনতে পাব, তখন সবাই মিলে চ্যাঁচামেচি শুরু করব। মানুষের চিৎকার শুনলে হাতি কাছে আসে। আর জোজো যদি বেসুরো গলায় একটা গান ধরে, হাতিরা সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালাবে।

জোজো বলল, কাকাবাবু, আমি একবার অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিশানে ফার্স্ট হয়েছিলাম।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, টপ্পা, না ঠুংরি?

জোজো সগর্বে বলল, খেয়াল! দরবারি কানাড়া গেয়েছিলাম, বুঝলি? জাজ ছিলেন ওস্তাদ বন্দে আলি মিঞা!

কাকাবাবু বললেন, তিনি খুব বিখ্যাত ওস্তাদ বুঝি? নাম শুনিনি। সে যাই হোক, হাতিরা খেয়াল শুনতে ভালবাসে, না ভয় পায়, তা নিয়ে গবেষণা করা দরকার।

রাজ সিংয়ের দিকে তাকিয়ে তিনি আবার বললেন, আপনারা গাড়িতে বসুন, আমি একটু ঘুরে আসি।

রাজ সিং আঁতকে উঠে বললেন, সে কী! আপনি একলা-একলা কোথায় যাবেন? না, না, এই জঙ্গলে পায়ে হেঁটে ঘোরা একেবারে নিরাপদ নয়।

কাকাবাবু হেসে বললেন, আমার যখন অল্প বয়েস ছিল, তখন অনেকবার শিকার করতে গেছি। ওড়িশার জঙ্গলে বাঘও মেরেছি। এখন তো শিকার করা নিষেধ। বাঘ, গণ্ডার এত কমে আসছে, এদের বাঁচিয়ে রাখাই উচিত। নেহাত আত্মরক্ষার প্রয়োজন না হলে কোনও

প্রাণীকেই আমি মারতে চাই না। কিন্তু রাত্তিরবেলা জঙ্গলে আসতে খুব ভাল লাগে। কোনও জন্তু-জানোয়ারের দেখা পেলে রোমাঞ্চ হয়। সেইজন্যই তো এসেছি এখানে।

রাজ সিং বললেন, গাড়িতে বসেই দেখুন, নামবার দরকার কী? কোনও-না-কোনও জন্তুর দেখা পাওয়া যাবেই।

কাকাবাবু বললেন, গাড়িতে আমরা বেশিক্ষণ চুপচাপ বসে থাকতে পারব। মুখ দিয়ে কথা বেরিয়ে আসবেই। কথা শুনতে পেলে কোনও জন্তু কাছে। আসবে না। আমি জলাটার ধার থেকে একটু ঘুরে আসি। ভয় নেই, আমি সাবধানে থাকব, কোনও জানোয়ারের মুখে প্রাণ দেওয়ার ইচ্ছে আমার একটুও নেই।

সন্তু বলল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি!

কাকাবাবু হুকুমের সুরে বললেন, না, আমি একলা যাব। তোমরা কেউ গাড়ি থেকে নামবে না।

কাকাবাবু রাইফেলটা নামিয়ে রেখে, ক্রাচদুটি তুলে নিয়ে পা দিলেন মাটিতে।

রাজ সিং ঝুঁকে পড়ে মিনতি করে বললেন, সার, আমি অনুরোধ করছি, আপনি এভাবে যাবেন না। একটা অঘটন ঘটে গেলে আমি বড়সাহেবের কাছে মুখ দেখাতে পারব না।

কাকাবাবু বললেন, মিস্টার সিং, আপনি আগে কোনও দিন এই জায়গাটায় এসে রাত কাটিয়েছেন?

রাজ সিং একটু থতমত খেয়ে বললেন, না, মানে, দিনের বেলা ঘুরে গেছি, রাত্তিরে কখনও থাকিনি।

কাকাবাবু বললেন, আমি যতদূর জানি, আপনার মতন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কোনও অফিসারই এত দূরে এসে রাত্তিরে থাকেননি।

তারপর কাকাবাবু আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

সন্তু আর জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোরা জোরে কথা বলিস না। আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ঘুরে আসব। ঝিলের ধারটা দেখে আসব শুধু।

সন্তু জানে, কাকাবাবু একবার জেদ ধরলে তাঁকে কিছুতেই ফেরানো যাবে।

ক্রাচে ভর দিয়ে কাকাবাবু এগোতে লাগলেন আস্তে-আস্তে। একটুক্ষণ তাঁকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল, তারপর মিলিয়ে গেলেন গাছপালার আড়ালে।

জোজো বলল, কাকাবাবু রাইফেলটাও নিলেন না?

সন্তু বলল, দু হাতে ক্রাচ থাকলে রাইফেল নেবেন কী করে? তবে ওঁর কোটের পকেটে রিভলভার আছে নিশ্চয়ই।

জোজো বলল, রিভলভার দিয়ে কি বাঘ মারা যায়?

সন্তু বলল, বাঘ মারা নিষেধ, তা জানিস না? হ্যাঁ রে, তুই কি এখনও বাঘের গন্ধ পাচ্ছিস?

জোজো বলল, একটু আগে পাচ্ছিলাম। এখন আর একটা বোঁটকা গন্ধ...নিশ্চয়ই বুনো শুয়োরের। জানিস, একবার মধ্যপ্রদেশে বাবার সঙ্গে গেছি, সন্ধেবেলা এরকম একটা জিপে করে যেতে-যেতে বাবা হঠাৎ বললেন, কাছাকাছি নেকড়ে বাঘ আছে। ঠিক তাই। জিপটা আরও দু মাইল এগোবার পর দেখা গেল, রাস্তার ওপরেই সার বেঁধে বসে আছে তিনটে নেকড়ে।

সন্তু বলল, তোর বাবা দু মাইল দূর থেকে গন্ধ পেয়েছিলেন?

জোজো বলল, দু মাইল আর এমন কী! একবার আমেরিকা থেকে আমাদের রাষ্ট্রদূত বাবাকে ফোন করেছিলেন। বাবা কথায় কথায় বললেন, তোমার বাড়িতে আজ বিরিয়ানি

রান্না হচ্ছে, তাই না? আমি টেলিফোনেই গন্ধ পেয়ে গেছি। নুন একটু কম হয়েছে, যে রান্না করছে তাকে আরও দু চামচ নুন মিশিয়ে দিতে বলো।

সন্তু বাঁ হাতে মুখ চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

রাজ সিং খুবই উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। তিনিও জোজোর কথা শুনে না হেসে পারলেন না। তারপরই গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললেন, তোমাদের আংকল গেলেন কোথায়? এইভাবে জঙ্গলের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার কোনও মানে হয়?

জোজো বলল, জানেন সিং সাহেব, আমার বাবা খুব বড় জ্যোতিষী! আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, ইংল্যান্ডের রানি, গারফিল্ড সোবার্স, পেলে, কপিলদেব, অমিতাভ বচ্চন, এঁরা সবাই আমার বাবার কাছে ভবিষ্যৎ জানতে চান।

হঠাৎ এ-কথার কী মানে হয় তা বুঝতে না পেরে রাজ সিং শুকনো ভদ্রতা করে বললেন, ও, তাই নাকি?

জোজো আবার বলল, আমার বাবার কাছে আমি জানতে চেয়েছিলাম, কাকাবাবুর ভবিষ্যৎ, মানে উনি কতদিন বাঁচবেন?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবুর ঠিকুজি কুষ্টি তুই কোথায় পেলি? কাকাবাবুর তো ওসব কিছু নেই- ই।

জোজো বলল, আমার বাবার কাছে ওসব দরকার হয় না। ছবি দেখলেই উনি বলে দিতে পারেন। কাকাবাবুর ছবি আমার কাছে নেই? বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, কাকাবাবুর ওপর অনেকের রাগ আছে, অনেক ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল কাকাবাবুকে খুন করতে চায়, কাকাবাবুর কি হঠাৎ কোনও বিপদ হতে পারে? বাবা অনেকক্ষণ দেখে-টেখে বললেন, নাঃ, একে হঠাৎ কেউ মেরে ফেলতে পারবে না। এর ইচ্ছামৃত্যু। নিজে ইচ্ছে না করলে এর মরণ হবে না। মহাভারতের ভীষ্ম যেমন, কাকাবাবু সেই টাইপের মানুষ!

রাজ সিং বললেন, কোনও লোক হয়তো মেরে ফেলতে পারবে না, কিন্তু জন্তু-জানোয়ার? তারাও কি জ্যোতিষীর গণনার মধ্যে পড়ে? এই জঙ্গলে অনেক বিষাক্ত সাপ আছে।

জোজো বলল, উঁহুঃ! সাপে কামড়ালেও উনি মরবেন না। ওই যে বললাম, ইচ্ছামৃত্যু!

সন্তু বলল, এত শীত, সাপের ভয়টা অন্তত এখন নেই। কাকাবাবু বলেছেন, আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবেন, আর কত বাকি?

রাজ সিং টর্চটা নীচের দিকে জ্বেলে, ঘড়ি দেখে বললেন, মাত্র এগারো মিনিট হয়েছে, তাতেই যেন মনে হচ্ছে কতক্ষণ কেটে গেল! কোনও জন্তুও দেখা যাচ্ছে না, এই জিপটার কথা সবাই টের পেয়ে গেছে!

এর পর একটুক্ষণ কথা না বলে সবাই চেয়ে রইল সামনের দিকে। কাকাবাবুর কোনও পাত্তাই নেই। অরণ্য একেবারে সুনসান। রাত্তিরবেলা সব জঙ্গলই খুব রহস্যময় হয়ে ওঠে। মনে হয়, অন্ধকারে কারা যেন লুকিয়ে আছে, তারা দেখছে, কিন্তু আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না।

এক-এক সময় শুকনো পাতায় খসখস শব্দ হচ্ছে। সে আওয়াজ এমন মৃদু যে, খরগোশের মতন ছোট প্রাণী ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ঝিলের জলে একবার একটু জোরে শব্দ হল, তাও অনেক দূরে।

আবার একটুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ সমস্ত নিস্তব্ধতা খানখান করে পর-পর দু বার রাইফেলের গুলির শব্দ হল। এত জোর সেই শব্দ, যেন পিলে চমকে গেল ওদের তিনজনের।

রাজ সিং সঙ্গে-সঙ্গে জিপের ওপরের সার্চলাইট জ্বেলে দিলেন। টর্চের আলোও ফেললেন সেই শব্দের দিক লক্ষ্য করে। সেই আলোর রেখা অনেক দূর পৌঁছলেও দেখা গেল না কিছুই। রাজ সিং টর্চটা ঘোরাতে লাগলেন, একজায়গায় দেখতে পেলেন, ঝোপঝাড় ঠেলে বেশ বড়সড় কোনও একটা প্রাণী দৌড়ে যাচ্ছে।

আরও দু বার গুলির শব্দ শোনা গেল, আওয়াজ যেন দু রকম।

সন্তু বলল, কাকাবাবুর কাছে রাইফেল নেই, অন্য কেউ...

সঙ্গে-সঙ্গে সন্তু লাফিয়ে জিপ থেকে নেমে ছুটতে শুরু করল। রাজ সিংও এক হাতে রাইফেল আর অন্য হাতে টর্চ নিয়ে দৌড়তে লাগলেন ঝিলের দিকে, জোজো প্রায় তাঁর পিঠ ছুঁয়ে রইল।

সন্তুই প্রথমে দেখতে পেল কাকাবাবুর একটা ক্রাচ। সেটা তুলে নিয়ে সে ব্যাকুলভাবে তাকাল এদিক-ওদিক।

রাজ সিং বললেন, ওই যে...

ঝিলের একেবারে ধার ঘেঁষে একপাশ ফিরে পড়ে আছেন কাকাবাবু। কপালে আর গালে রক্তের রেখা। সন্তুর বুকের মধ্যে যেন ভূমিকম্প হতে লাগল। এরকমভাবে শুয়ে আছেন কেন কাকাবাবু? বেঁচে নেই? জোজোর বাবা বলেছিলেন, ইচ্ছামৃত্যু...

সন্তু বসে পড়ল হাঁটু গেড়ে।

ঠিক যেন একজন মৃত লোক বেঁচে ওঠার মতন কাকাবাবু অন্য পাশ ফিরে খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন, তোরা আবার জিপ থেকে নামতে গেলি কেন? গোলাগুলি চলছিল, তোদের বিপদ হতে পারত!

২. তেজপুর শহরের একটু বাইরে

তেজপুর শহরের একটু বাইরে, ছোট্ট একটা টিলার ওপর সুন্দর সাদা রঙের একটি দোতলা বাড়ি। সামনে গোলাপ ফুলের বাগান, কিন্তু পাঁচিল-টাচিল নেই। বারান্দায় বসলে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।

বাগানেই বেতের টেবিল ও কয়েকখানা চেয়ার পেতে চায়ের ব্যবস্থা হয়েছে। সকালবেলায় রোদুর মিঠে লাগছে খুব। টেবিলের ওপর অনেক রকমের খাবার, মাশরুম দিয়ে ওমলেট, ফুলকপির শিঙাড়া, মাছের ডিমের চপ, কাজুবাদাম, কেক-পেস্ট্রি। চায়ের পেয়ালাগুলো ভারি সুন্দর।

এ-বাড়ির মালিকের নাম দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর। চমৎকার চেহারা, ফরসা, লম্বা, টানা-টানা চোখ, ধারালো নাক, মাথাভর্তি কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। ইনি অসমের বন বিভাগের সবচেয়ে বড় কর্তা, যাকে বলে চিফ কনজারভেটার অব ফরেস্ট। চাকরির জন্য ওঁকে থাকতে হয় গুয়াহাটি শহরে, তেজপুরে তাঁর নিজের বাড়ি।

দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর সন্তু আর জোজোকে বারবার বলতে লাগলেন, কই, তোমরা খাও, আরও নাও, লজ্জা পাচ্ছো নাকি?

জোজোর অবশ্য লজ্জা-টজ্জা নেই। সে সবগুলো পদই দুটো-একটা করে চেয়ে নিয়েছে, আবার নিল। সন্তু বেশি খেতে পারছে না।

কাকাবাবু চা ছাড়া কিছু খাননি। তাঁর সারা মুখে ব্যথা। মুখের চেহারাটাও বিচ্ছিরি হয়ে গেছে। মুখের বাঁ পাশটাতে কাটাকুটি দাগ, তার ওপর আবার মারকিউরিওক্রোম ওষুধ লাগানো। রাজ সিং বসে আছেন একধারে চুপ করে।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকলে দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, এইবার বলুন, মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনার হঠাৎ অসমের এই অঞ্চলটায় আসবার উদ্দেশ্য কী?

কাকাবাবু মুখে হাসি মাখিয়ে বললেন, সেরকম উদ্দেশ্য তো বিশেষ কিছু নেই। এমনই বেড়াতে এসেছি, জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরব!

দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর দুদিকে মাথা নেড়ে বললেন, উঁহুঃ! আপনি একথা বললেও তো বিশ্বাস করতে পারি না। আপনি কত রকম সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড করেছেন, তা কি আমরা জানি না? আপনাদের বাংলায় একটা কথা আছে না, চেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে?

কাকাবাবু বললেন, আজকাল ওকথার কেউ মানেই বোঝে না। তিনি সন্তুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, সন্তু, তুই চেঁকি কাকে বলে জানিস?

সন্তু বলল, ছবি দেখেছি। একটা মস্ত বড় কাঠের জিনিস। গ্রামের মেয়েরা সেই চেঁকিতে পাড় দিয়ে ধান থেকে চাল বানাত।

বড়ঠাকুর বললেন, তা ঠিক, এখন আর চেঁকি দেখাই যায় না। মেশিনে সব হয়। আমাদের এখানে গ্রামের দিকে কিছু-কিছু চেঁকি এখনও আছে। চেঁকিছাঁটা চালের ভাতের অন্যরকম স্বাদ।

কাকাবাবু বললেন, ছবি দেখে চেঁকি চিনতে হয়। এর পর ছেলেমেয়েরা বাঘ-ভালুক-গণ্ডার এসবও ছবি দেখেই চিনবে। সব তো মেরে-মেরে শেষ করে দেওয়া হচ্ছে।

বড়ঠাকুর আগের কথায় ফিরে গিয়ে কাকাবাবুকে আবার জিজ্ঞেস করলেন, তেজপুরে কি কোনও উল্কা পড়েছে? কিংবা জঙ্গলের মধ্যে অন্য গ্রহের প্রাণী নেমেছে? নইলে আপনি হঠাৎ এদিকে এসেছেন, নিশ্চয়ই কোনও রহস্যের সন্ধানে!

কাকাবাবু বললেন, না, না, আমি জঙ্গল ভালবাসি, জঙ্গল দেখতে এসেছি। অসমের জঙ্গল অতি অপূর্ব।

বড়ঠাকুর বললেন, জঙ্গল দেখতে চান, সব ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। কাজিরাঙা, মানস ফরেস্ট, ওরাং, এ ছাড়া আরও কত জঙ্গল ছড়িয়ে আছে। কিন্তু রায়চৌধুরী সাহেব, আপনি কাল একটা অন্যায় করেছেন!

কী অন্যায় করেছি?

এইসব সংরক্ষিত অরণ্যে আমরা রাত্তিরে কাউকে যেতে দিই না। জঙ্গল দেখতে হয় খুব ভোরবেলা। হাতির পিঠে চেপে ঘুরবেন, খুব ভাল দেখা যাবে। কিন্তু আপনি রাত্তিরবেলা গিয়েছিলেন, তারপর জিপ থেকে নেমে পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন, এটা অন্যায়, খুব অন্যায়। সেজন্য আমি আমার ডি এফ ও রাজ সিংকে বকুনি দিয়েছি। যদি কোনও জন্তু-জানোয়ার হঠাৎ আপনাকে আক্রমণ করত, তা হলে বদনামের ভাগি হতে হত আমাদের। আপনি বিখ্যাত লোক

বড়ঠাকুরমশাই, আমায় তো কোনও জানোয়ার আক্রমণ করেনি। আমায় যারা মারতে গিয়েছিল, তারা মানুষ। তাদের হাতে বন্দুক আছে।

মানুষ?

মানুষ ছাড়া কে আর বন্দুকের গুলি চালাবে?

ব্যাপারটা ঠিক কী হয়েছিল, আর-এক বার খুলে বলুন তো?

আমরা কাল মিহিমুখ থেকে জিপ নিয়ে বেরিয়েছিলাম। হারমোতিতে রয়েছে ওয়াচ টাওয়ার, সেখানে তো অনেক লোকই যায়। আমরা আরও গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেলাম। সোহোলা ছাড়িয়ে তিন-চার কিলোমিটার দূরে একটা ঝিল, সেখানে নিরিবিলিতে কিছুক্ষণ কাটাতে চেয়েছিলাম।

বেশ তো, কিন্তু আপনি জিপ থেকে নামতে গেলেন কেন?

বন্যপ্রাণীরা যখন জলপান করতে আসে, সেই দৃশ্যটা ভারী সুন্দর। দল বেঁধে গেলে সেটা দেখা যায় না। তাই আমি একলা চুপিচুপি গিয়ে জলের ধারে বসে ছিলাম। হঠাৎ কে যেন আমার দিকে গুলি চালিয়ে দিল। টিপ ভাল নয়, আমার গায়ে লাগাতে পারেনি। শব্দ শুনেই আমি ঝপ করে শুয়ে পড়েছিলাম মাটিতে, গোলাগুলি চললে সেটাই নিয়ম। কিন্তু মুশকিল হল কী, যেখানে আমি পড়লাম, সেখানে ছিল কাঁটাগাছের ঝোপ, তাও কাঁটাগুলো আবার বিষাক্ত। আমার গালফাল তো কেটে গেলই, জ্বালাও করতে লাগল দারুণ। সামলে নিতে আমার কিছুটা সময় লাগল, তাই পালটা গুলি যখন ছুঁড়তে গেলাম, তখন আততায়ী অনেকটা দূরে পালিয়ে গেছে।

হঠাৎ কে আপনাকে মারবার চেষ্টা করবে?

সেটাই তো বড় প্রশ্ন। আপনারা রাত্তিরবেলা ভ্রমণকারীদের জঙ্গলে যেতে দেন না। নিজেরাও যান না। সেই সুযোগে চোর ডাকাত চোরাচালানদার পোচাররা যা খুশি করে বেড়ায়!

মিঃ রায়চৌধুরী, আমরা যথাসাধ্য জঙ্গল পাহারা দিই, তা সত্ত্বেও কিছু দুষ্ট লোক, কিছু গাছ-চোর, কিছু পোচার ঢুকে পড়ে ঠিকই, সব আটকানো যায় না স্বীকার করছি। আচ্ছা পোচার কথাটাকে আপনাদের বাংলায় কী বলে?

কাকাবাবু একটু চিন্তা করে কিছু খুঁজে পেলেন না। সন্তু আর জোজোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, পোচারের বাংলা কী হবে?

জোজো বলল, যারা লুকিয়ে লুকিয়ে বেআইনি ভাবে জন্তু-জানোয়ার শিকার করে, বাইরে বিক্রি করে।

কাকাবাবু বললেন, এককথায় বলতে হবে।

জোজো বলল, বেআইনি পশু-হত্যাকারী।

সন্তু বলল, চোরাশিকারি হতে পারে না?

বড়ঠাকুর বললেন, চোরাশিকারি, হ্যাঁ, এটাই শুনতে ভাল, চোরাশিকারি! হ্যাঁ। মিস্টার রায়চৌধুরী, যা বলছিলাম! এই গাছ-চোর কিংবা চোরাশিকারি তো কখনও মানুষ মারে না! সেরকম কোনও দৃষ্টান্ত নেই। কখনও ফরেস্ট গার্ডদের সামনাসামনি পড়ে গেলেও এরা পালাবার চেষ্টা করে। আপনাকে দেখামাত্র এরা গুলি চালাবে কেন? অন্ধকারে লুকিয়ে পড়তে পারত!

কাকাবাবু বললেন, আমার কোনও পুরনো শত্রু ঠিক সেই সময় জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে ছিল, একথা তো বিশ্বাস করা যায় না! একজন কেউ গুলি করে আমাকে মারতে চেয়েছিল ঠিকই।

বড়ঠাকুর বললেন, ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। বেশ রহস্যজনক লাগছে।

রাজ সিং এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। এবার বললেন, আচ্ছা রায়চৌধুরীবাবু, সোহোলার ওদিকটায় যে একটা ঝিল আছে, সেটার কথা কি আপনি আগে থেকেই জানতেন? প্রথম থেকেই জিপটা ওদিকে নিয়ে যেতে বললেন, এই জঙ্গলে আগে খুব ঘুরেছেন বুঝি?

কাকাবাবু বললেন, না, এখানে আগে আসিনি। কিন্তু কোনও নতুন জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার আগে আমি সেই জায়গাটা সম্পর্কে পড়াশোনা করি, খোঁজখবর নিই। আমার কাছে খুব বড় একটা ম্যাপের বই আছে, তাতে এ-দেশের সব জঙ্গলের ম্যাপ আছে, কোথায় কোন ভাঙা দুর্গ বা কটা জলাশয়, সেসব দেখানো রয়েছে।

বড়ঠাকুর বললেন, ফরেস্ট অ্যাটলাস অব ইন্ডিয়া বইটা তো? খুবই মূল্যবান বই। যাই হোক, আপনার গায়ে যে গুলি লাগেনি, এটাই খুব ভাগ্যের কথা। আপনি আমাদের রাজ্যে অতিথি। আপনার জন্য গাড়ি থাকবে, সব জঙ্গলের বাংলোর ঘর বুক করা থাকবে। আমি আপনার সঙ্গে থাকতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু আমাকে ফিরতে হবে গুয়াহাটি। রাজ

সিং তো রইলেনই, এ ছাড়া শচীন সইকিয়া আর তপন রায় বর্মণ নামে দুজন অফিসারের ওপর ভার দিয়ে যাচ্ছি। আপনাদের যখন যা লাগবে, ওঁরা ব্যবস্থা করে দেবেন।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়াতেই বড়ঠাকুর করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন তাঁর দিকে। কাকাবাবু তাঁর হাত ধরে ঝাঁকিয়ে বললেন, সিনাকি হৈ ভাল্ লাগিল্।

বড়ঠাকুর অবাক হয়ে বললেন, আপনি অসমিয়া ভাষা জানেন নাকি?

কাকাবাবু হেসে বললেন, একটু-একটু জানি। কতবার আপনাদের এখানে এসেছি।

বড়ঠাকুর সবাইকে বাগানের গেটের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, আমার অনুরোধ, আপনারা ভোরের দিকেই জঙ্গল দেখতে যাবেন। তখন কত ফুল, কত পাখি দেখা যায়। রাত্তিরেরও একটা আলাদা রূপ আছে, তা মানি। রাত্তিরে যদি যেতেই চান, তা হলে সঙ্গে অন্তত চারজন আমর্ড গার্ড থাকবে। তারা আপনাদের পাহারা দেবে।

কাকাবাবু বললেন, আমর্ড গার্ড আমি নিতে চাই না। সর্ষের মধ্যে ভূত, এই কথাটা আপনি জানেন?

বড়ঠাকুর বললেন, ভূত? না, জানি না তো?

কাকাবাবু বললেন, পুলিশ কিংবা আমর্ড গার্ডদের মধ্যে দু-একজন হচ্ছে সেই ভূত। এদের সঙ্গে গাছ-চোর কিংবা চোরাশিকারিদের গোপন যোগাযোগ থাকে। এরা আগে থেকে সব খবর দিয়ে দেয়। সেইজন্যই আমি কাল রাতে সঙ্গে কোনও পাহারাদার নিইনি, এমনকী জিপের ড্রাইভারও ছিল না।

বড়ঠাকুর বললেন, ও, এই ভূত? তা আপনার কথাটা একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। বিশ্বাসঘাতকরা কোথায় নেই বলুন? যাই হোক, সাবধানে থাকবেন!

আজ ওদের জন্য একটি স্টেশন ওয়াগন মজুত রয়েছে। সারাদিন ইচ্ছেমতন ঘোরা যাবে। রাজ সিং সঙ্গে আসতে পারবেন না, তাঁর অফিসের কাজ আছে। তখনই ডাকবাংলোয় ফিরতে না চেয়ে কাকাবাবু বললেন, চল, দু-একটা পুরনো জায়গা দেখে আসি।

গাড়ির ড্রাইভারকে তিনি বললেন, ময় বামুনি পাহাড় লৈ যাব বিসারু।

গাড়ি চলতে শুরু করলে সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, তুমি বড়ঠাকুরকে অসমিয়া ভাষায় যে-কথাটা বললে, তার মানে কী?

কাকাবাবু বললেন, বুঝলি না? সিনাকি হৈ ভাল লাগি! সিনাকি মানে চেনা। পরিচিত হওয়া। আপনার সঙ্গে চেনা হয়ে ভাল লাগল! একটু-আধটু উচ্চারণের তফাত, নইলে অসমিয়া ভাষা আমাদের পক্ষে বেশ সোজা। মনে রাখবি। এখানে ময় মানে আমি। যেমন হিন্দিতে বলে ম্যায়!

জোজো বলল, বাংলাতেও অনেক গ্রামের লোক বলে মুই।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক। আর আমি মানে অসমিয়াতে আমরা।

সন্তু বলল, তেজপুর নামটা বেশ ভাল।

কাকাবাবু বললেন, শহরটাও সুন্দর। পরিষ্কার, ছিমছাম। জানিস, এই তেজপুরের আগে অনেক নাম ছিল। দেবীকূট, ঊষাবন, কোটিবর্ষা, বনপুর, শোণিতপুর।

জোজো বলল, এর মধ্যে ঊষাবন নামটাই আমার বেশি ভাল লাগছে।

কাকাবাবু বললেন, এককালে ঊষা নামে এখানে এক রাজকন্যা ছিল। অপরূপ সুন্দরী। অনিরুদ্ধ এসে তাকে এখান থেকে হরণ করে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে।

সন্তু জোজোকে জিজ্ঞেস করল, অনিরুদ্ধ কে বল তো?

জোজোর চেয়ে সন্তু রামায়ণ-মহাভারত অনেক ভাল করে পড়েছে। জোজো কিছু না জানলেও হার স্বীকার করে না। সে বলল, আর-একটা কোনও রাজাটাজা হবে। দ্বারভাঙ্গার রাজা।

সন্তু বলল, মোটেই না। অনিরুদ্ধ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের এক ছেলে। শ্রীকৃষ্ণের রাজধানী ছিল দ্বারকায়। সেই গুজরাতে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, জোজো, তুমি হঠাৎ অনিরুদ্ধকে দ্বারভাঙ্গার রাজা বললে কেন?

জোজো বলল, অনিরুদ্ধ মানে যাকে রুদ্ধ করে রাখা যায় না। আর দ্বারভাঙ্গা মানে যেখানে দরজা ভেঙে গেছে। দরজা ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল অনিরুদ্ধ।

কাকাবাবু বললেন, একেই বলে উপস্থিত বুদ্ধি। এই অনিরুদ্ধ অত দূরের দ্বারকা থেকে এখানে এসেছিল বিয়ে করতে? শখ তো কম নয়!

একটু পরেই গাড়িটা গিয়ে পৌঁছল বামুনি পাহাড়ে। সেখানে আসলে দেখবার কিছু নেই। শুধু কয়েকটা মন্দিরের ধ্বংসস্থূপ। তবে এমনিই পাহাড়ের ওপর বসে থাকতে ভাল লাগে।

কাকাবাবু কয়েক টুকরো পুরনো পাথর নিয়ে দেখতে লাগলেন মনোযোগ দিয়ে। সন্তু আর জোজো ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। আকাশ আজ ঝকঝকে নীল, মাঝে-মাঝেই ঝাঁক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে।

একটু বাদে একটা জিপ গাড়ি উঠে এল সেখানে। কাকাবাবু সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। ড্রাইভারের পাশ থেকে একজন লোক নেমে এগিয়ে আসতে-আসতে হাত জোড় করে বলল, নমস্কার, কাকাবাবু!

কাকাবাবু লোকটিকে একেবারেই চেনেন না। বত্রিশ-তেত্রিশ বছর বয়েস, প্যান্টের ওপর পরে আছে একটা গাঢ় লাল রঙের ফুলহাতা সোয়েটার।

কাছে এসে সে বলল, আমার নাম তপন রায় বর্মণ। ফরেস্ট অফিসে কাজ করি। বড়ঠাকুর সাহেব বললেন আপনাদের কথা, তাই ভাবলাম দেখা করে আসি।

কাকাবাবুও নমস্কার জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী করে জানলেন যে আমরা এখানে এসেছি?

তপন রায় বর্মণ বলল, তেজপুরে বেড়াতে এসে সকলেই এখানে একবার আসে। তাই চান্স নিলাম।

সন্তু ও জোজোকে ডেকে কাকাবাবু ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

তপন বলল, আপনারা যদি পুরনো জঙ্গল দেখতে চান, তা হলে আর-একটা জায়গায় নিয়ে যেতে পারি। দা পার্বতীয়া। সেখানে বহুকালের প্রাচীন পাথরের দরজা রয়েছে।

কাকাবাবু বললেন, আজকের দিনটা এত সুন্দর, বেড়াবার মতনই দিন। চলুন, ঘুরে আসা যাক।

তপন বলল, আপনি আমাকে শুধু নাম ধরে ডাকবেন, তুমি বলবেন। আমিও আপনাকে কাকাবাবু বলব, মিস্টার কিংবা বাবুটাবু আমার বলতে ভাল লাগে না।

সন্তু আর জোজোর দিকে ফিরে বলল, তোমরাও আমাকে তপনদা বলবে।

তপন নিজের জিপগাড়িটা ছেড়ে দিয়ে কাকাবাবুদের স্টেশন ওয়াগনে চড়ে বসল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, কাকাবাবু, আজও কি আমরা রাত্তিরে জঙ্গলে যাব?

কাকাবাবু বললেন, নাঃ! আজ রাতটা আমি ভাল করে ঘুমোব। কাল সকালে কী করা যায়, পরে ভেবে দেখা যাবে!

জোজো বলল, কাল সকালে হাতির পিঠে চেপে ঘুরলে হয় না? আমার তো মাহুত লাগবে না, আমি নিজেই হাতি চালাতে জানি। সন্তু বলল, তুই কোথায় হাতি চালানো শিখলি রে?

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, আফ্রিকায়। সেখানে আমার নিজস্ব পোষা হাতি ছিল।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে, কাল সকালে তোমার হাতি চালানো দেখব।

রাস্তাটা সারানো হচ্ছে বলে গাড়ি চলছে আস্তে-আস্তে। পেছন থেকে আর-একটা গাড়ির খুব তাড়া আছে মনে হয়, হর্ন দিচ্ছে বারবার। কিন্তু সে-গাড়িকে এগিয়ে যেতে দেওয়ার উপায় নেই। পেছনের লাল রঙের গাড়িটা অনবরত হর্ন দিতে লাগল।

কাকাবাবু দু হাতে কান চাপা দিয়ে বললেন, উঃ, এত হর্ন দেয় কেন?

খানিক বাদে পেছনের গাড়িটা পাশের মাঠে নেমে পড়ে ধুলো উড়িয়ে কোনওরকমে সামনে চলে এল, তারপর রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল আড়াআড়িভাবে। সেই গাড়ির সামনের সিট থেকে নেমে এল একজন লোক। তাকে দেখেই চমকে উঠতে হয়। ছ ফুটের বেশি লম্বা, তেমনই চওড়া, মনে হয় যেন পাহাড়ের মতন মানুষ। তার দু দিকের মোটা জুলপি জুড়ে আছে গালের অনেকখানি, গোঁফ নেই।

সে-লোকটি গটমটিয়ে এসে এ-গাড়ির ড্রাইভারের কলার চেপে ধরে একটা গালাগালি দিয়ে বলল, এই, তুই আমার রাস্তা আটকে ছিলি কেন রে? হর্ন দিচ্ছি, শুনতে পাচ্ছিস না? কানে কালা?

কাকাবাবু তপন রায় বর্মণের দিকে তাকালেন। তার মুখোনি শুকিয়ে গেছে, লোকটিকে দেখে ভয় পেয়েছে। সে মিনমিন করে বলল, রাস্তা যে ভাঙা, জায়গা ছিল না!

ড্রাইভারও কোনও প্রতিবাদ করছে না। লোকটি আবার একটা গালাগাল দিতেই কাকাবাবু শান্ত, দৃঢ় গলায় বললেন, ওর কলার ছেড়ে দিন। ভদ্রভাবে কথা বলুন!

লোকটি কৌতূহলীভাবে কাকাবাবুর দিকে তাকাল। কুটিলভাবে ভুরু কুঁচকে বলল, এ আবার কে? নতুন লোক দেখছি!

তপন তাড়াতাড়ি বলল, আজ্ঞে, ইনি আমাদের কনজারভেটর সাহেবের অতিথি। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন। এঁর নাম রাজা রায়চৌধুরী।

লোকটি ড্রাইভারের কলার ছেড়ে দিয়ে বলল, রাজা রায়চৌধুরী! তাই নাকি? ইনিই সেই? নমস্কার, নমস্কার! ও, সেইজন্যই আমার গাড়িকে আগে যেতে দেয়নি? আমি ভাবলাম, কার এমন সাহস যে, আমার গাড়িকে জায়গা ছাড়বে না? আমার গাড়ির নাম্বার দেখেছেন? ৫৫৫৫। সবাই এ-গাড়ি চেনে!

কাকাবাবু কোনও কথা না বলে লোকটির মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলেন।

লোকটি বলল, রাজা রায়চৌধুরী, আপনার নাম আমি শুনেছি। আপনি বেড়াতে এসেছেন, একদিন আমার বাড়িতে চা খেতে আসুন। আপনারা সবাই আসুন, আজই সন্ধেবেলা। তপনবাবু, তুমি এদের নিয়ে আসবে। আচ্ছা, তখন কথা হবে। চলি!

লোকটি আবার ফিরে গেল নিজের গাড়িতে। সেটা হুশ করে অনেক জোরে বেরিয়ে গেল।

কাকাবাবু তপনকে জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা কে?

তপন বলল, ওর নাম হিম্মত রাও। খুব বড় ব্যবসাদার। কাঠের ব্যবসা, পেট্রল পাম্প, অনেক কিছু আছে।

কাকাবাবু বললেন, হোক না বড় ব্যবসাদার। তোমরা ওকে ভয় পাও কেন?

তপন বলল, ওর অনেক টাকা। অনেক দলবল। সবাই ওকে ভয় পায়, এমনকী, পুলিশও ভয় পায়। ওর সঙ্গে কারও ঝগড়া হলে তারপর আর তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বোধ

হয় খুন করে জঙ্গলে কোথাও ফেলে দিয়ে আসে। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

কাকাবাবু বললেন, ও আমাকে চিনল কী করে?

তপন বলল, আপনি বিখ্যাত লোক, আপনাকে অনেকেই চেনে।

কাকাবাবু বললেন, উঁহুঃ! একজন কাঠের ব্যবসাদার কী কারণে আমাকে চিনবে? তুমি ওর কাছে আমার নাম বলতে গেলে কেন? এর পর থেকে যার-তার কাছে আমার নাম বলবে না, পরিচয়ও দেবে না।

তপন বলল, হিম্মত রাও আপনাকে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করল–

পেছন থেকে সন্তু বলল, আমরা মোটেই যাব না। লোকটা অভদ্র! কেন ওকে সবাই আগে যেতে দেবে? ও কি লাটসাহেব নাকি?

জোজো বলল, ইস্কাবনের গোলাম!

সন্তু বলল, অনেকটা। একটা জিনিস লক্ষ করেছিস, জোজো? ওর গলায় সোনার হারের সঙ্গে যে লকেট, তাতে একটা হনুমানের ছবি!

জোজো বলল, এইসব লোককে জব্দ করা খুব সহজ। কোনও রকমে ওর ডান হাঁটুতে একটা আলপিন ফুটিয়ে দিতে পারলেই বাপ রে, মা রে বলে চ্যাঁচাবে!

কাকাবাবু বললেন, তাই নাকি? সামান্য একটা আলপিনে অত বড় চেহারার মানুষ কাবু হয়ে যাবে?

জোজো বলল, হ্যাঁ, কাকাবাবু, যেসব লোক খুব লম্বা আর মোটা হয়, তাদের হাঁটুতে জল জমে থাকে। একটা আলপিন ফোটালেই সেই জল তিরতির করে বেরিয়ে আসবে, আর

তখন এত ব্যথা হবে... সেইজন্যই তো আমি নিজের কাছে সবসময় কয়েকটা সেফটিপিন রাখি!

তপন অবাক হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জোজোর দিকে।

দা পার্বতীয়া দেখে ফেরার পথে আর-একটি ঘটনা ঘটল।

একটা জংলা জায়গার সরু পথ থেকে একটা সাইকেল উঠে এল বড় রাস্তায়। সেটা চালাচ্ছে একজন খাকি প্যান্ট আর সবুজ চাদর জড়ানো লোক, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। তার সাইকেলের দু পাশে দুটো বোঝা চাপানো আছে।

এই গাড়ির ড্রাইভার তপনকে বলল, সার, ওই দেখুন জলিল!

তপন বলল, ব্যাটা আবার বেরিয়েছে? ধরো তো, ধরো ওকে!

স্টেশন ওয়াগনটা স্পিড বাড়িয়ে কাছে আসতেই সাইকেল আরোহী ড্রাইভারকে দেখে চমকে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে সে সাইকেল ঘুরিয়ে নেমে পড়ল মাঠের মধ্যে। এ-গাড়িটাও তাড়া করল তাকে। এবড়োখেবড়ো মাঠ, সদ্য ধান কাটা হয়ে গেছে, ধানগাছের গোড়াগুলো উঁচু হয়ে আছে। সেই লোকটি তারই মধ্যে এঁকেবেঁকে সাইকেল নিয়ে পালাতে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল একজায়গায়। তারপর সাইকেল ফেলেই সে দৌড় লাগাল। তপনও তড়াক করে লাফিয়ে নেমে ছুটে গেল তার পিছু-পিছু। তপনও বেশ জোরে দৌড়োয়, কিন্তু জলিল অনেক ক্ষিপ্র।

এবার সন্তু আর জোজোও নেমে পড়ল। শুরু হয়ে গেল মাঠের মধ্যে চোর-চোর খেলা। কাকাবাবু সেই খেলা দেখে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। জলিল ওদের তিনজনকেই নাস্তানাবুদ করে দিল। কাকাবাবু গাড়ির ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, বলো তো, শেষপর্যন্ত লোকটা পালাবে, না, ধরা পড়বে?

ড্রাইভার বলল, এ-লোকটা মহা ধড়িবাজ, এর আগে দুবার পালিয়েছে!

কাকাবাবু বললেন, এবার ঠিক ধরা পড়ে যাবে। ওই যে নীল কোট পরা ছেলেটি, শেষপর্যন্ত ও-ই ধরে ফেলবে!

তপন আর সন্তু-জোজো তিনদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে জলিলকে। এবার আর তার নিস্তার নেই। তপন দু হাত তুলেছে ওকে ধরার জন্য, তবু জলিল সুড়ত করে গলে গেল। ক্রিকেট-মাঠে ভাল ফিল্ডার যেমন ডাইভ দিয়ে শুয়ে পড়ে ক্যাচ ধরে, সন্তু সেইভাবে এক লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরল জলিলের একটা পা। সে আর ছাড়াতে পারল না।

জলিলকে টানতে-টানতে নিয়ে আসা হল তার গাড়ির কাছে। তপন ওর সাইকেলটাকেও নিয়ে এল। সাইকেলটার দু পাশে কাপড় দিয়ে ঢাকা দুটো খাঁচা। তার মধ্যে দশ বারোটা পাখি। সবসুন্ধু তোলা হল গাড়ির পেছনে।

জোজো বলল, দেখলেন তো কাকাবাবু। আমি এমন প্যাঁচ কষে ওকে। সন্তুর দিকে ঠেলে দিলাম, তাই তো সন্তু ওকে ধরতে পারল!

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, দেখলাম তো! কিন্তু ওকে ধরা হল কেন?

তপন বলল, দেখছেন না, কত ভাল-ভাল পাখি ধরেছে। এগুলো বর্মা বর্ডার দিয়ে বিদেশে চালান যায়। এইসব পাখি ধরাই বেআইনি। এর আগে দু বার আমাদের হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছে!

সন্তু কোটের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে জিজ্ঞেস করল, এগুলো কী পাখি?

তপন বলল, বেশির ভাগই ময়না। বিদেশে অনেক দামে বিক্রি হয়। কথা শেখালে মানুষের মতন কথা বলতে পারে। দুটো সবুজ ঘুঘু পাখি, এরও খুব দাম, আর তিনটে হর্ন বিল–

জলিলের মুখে একটা একরোখা ভাব। যেন সে একটুও ভয় পায়নি। ট্যাঁক থেকে একটা টিনের কৌটো বের করে তার থেকে একটা বিড়ি ধরাল।

কাকাবাবু বললেন, ওকে নিয়ে এখন কী করবে?

তপন বলল, থানায় জমা দেব।

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, তারপর ওর কী শাস্তি হবে?

তপন বলল, সেই তো মুশকিল! এদের পেছনে বড়-বড় লোক থাকে। কোর্টে কেস উঠলে কোথা থেকে একজন উকিল এসে জামিনে ছাড়িয়ে নিয়ে। যায়। অনেকদিন কেস চলে। তারপর সামান্য কিছু টাকা জরিমানা হয়, সে-টাকাটাও উকিল দিয়ে দেয়।

কাকাবাবু বললেন, হুঁঃ! তা হলে আর ওকে থানায় নিয়ে গিয়ে লাভ কী? ওকে বরং ওর বাড়িতে পৌঁছে দাও!

তপন চোখ বড় বড় করে কাকাবাবুর দিকে চেয়ে রইল।

কাকাবাবু বললেন, বেচারা কত কষ্ট করে পাখিগুলো ধরেছে, তারপর মাঠে এত দৌড়োদৌড়ি করল, অনেক পরিশ্রম গেছে। বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম নিক। কী বলল হে জলিল, সেটাই ভাল না? তোমার বাড়িতে গেলে আমাদের পানিটানি খাওয়াবে তো?

জলিল বলল, আমি এখন বাড়ি যাব না!

কাকাবাবু বললেন, সে কী, তোমাকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, তুমি যাবে না?

জলিল দৃঢ়ভাবে বলল, না!

তপন বলল, ওর বাড়ি আমাদের চেনাতে চায় না।

ড্রাইভার বলল, যতদূর মনে হয়, জামগুঁড়ি গ্রামের কাছাকাছি ওর বাড়ি। ওখানকার হাটে আমি ওকে দু-এক বার দেখেছি।

কাকাবাবু বললেন, ব্যস, তা হলে আর কী! ওই গ্রামে গেলেই ওর বাড়ির খোঁজ পাওয়া যাবে। সন্তু, জোজো, ওকে ভাল করে ধরে রাখিস, যেন লাফিয়ে হঠাৎ পালিয়ে না যায়। ওর বাড়িতে আমরা যাবই!

জামগুঁড়ি গ্রামে দু-এক জন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, জলিলের বাড়ি পাশের গ্রাম সানকিভাটায়। সে-গ্রামের এক প্রান্তে একটি সুপুরিগাছ-ঘেরা মাটির বাড়ি, পাশে একটা ছোট্ট পুকুর।

কাকাবাবু সে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে চারদিকটা দেখলেন। এক পাশে রান্নাঘর। অন্য দিকে গোয়ালঘর, একটা ছোটমতন ধানের গোলা, বাড়ির পেছনে বাগান। ওদের শোওয়ার ঘরের বারান্দায় বাড়ির মেয়েরা ভয়চকিত মুখে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

কাকাবাবু সেদিকে এগিয়ে গিয়ে একটি দশ-এগারো বছরের মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, জলিল তোমার কে হয়? আব্বাজান? পাখিগুলো কোথায় রাখে বলো তো মা, ভয় নেই, তোমার বাবাকে কেউ কিছু বলবে না, মারবেও না।

মেয়েটি চোখে হাত দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কাকাবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে বললেন, কাঁদছ কেন? কোনও ভয় নেই। পাখিগুলো কোথায় দেখিয়ে দাও, তোমার বাবা ছাড়া পেয়ে যাবে।

মেয়েটি তবু কোনও কথা না বলে কেঁদেই চলল।

কাকাবাবু বললেন, তুমি দেখিয়ে দিলে না তো? তা হলে আমরাই খুঁজে নিচ্ছি। পাখি খোঁজা খুব সহজ।

কাকাবাবু কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে শূন্যের দিকে একবার ফায়ার করলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বাড়ির ভেতরে খাঁচার পাখিগুলো ডেকে উঠল, আশপাশের গাছ

থেকে অনেক কাক ভয় পেয়ে কাকা করে উড়ে গেল, আর গোয়ালঘরের মধ্য থেকে অনেক পাখির কিচিরমিচির শোনা গেল।

তপন, সন্তু-জোজো ছুটে গেল গোয়ালঘরে। সেখানে একটি মাত্র গরু, তার পেছনে একটা চটের পরদা টাঙানো। সেই পরদার পেছনে মাটিতে খানিকটা গর্ত খুঁড়ে রাখা আছে অন্তত কুড়িটা বাঁশের খাঁচা। তার মধ্যে গাদাগাদি করে রাখা আছে পাখি, শ পাঁচেক তো হবেই। ময়না, তিতির, ঘুঘু, ধনেশ, আরও নানা জাতের পাখি।

ওরা তিনজন খাঁচাগুলো নিয়ে আসতে লাগল উঠোনে। জলিল কোমরে হাত দিয়ে তাকিয়ে আছে জ্বলজ্বলে চোখে। কাকাবাবু মেয়েটির কাঁধে হাত রেখে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? ফিরোজা? বাঃ, কী সুন্দর নাম।

তপন বলল, বিগ ক্যাচ! একসঙ্গে এত পাখি, দুর্লভ সব পাখি।

কাকাবাবু বললেন, জলিলকে মোটে দশ বারোটা পাখিসমেত থানায় নিয়ে গেলে কী লাভ হত! বড়জোর একশো-দুশো টাকা ফাইন হত। বিদেশে একসঙ্গে অনেক পাখি চালান যায়, মোটা টাকার কারবার।

তপন বলল, এইসব খাঁচা আটক করে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের গাড়িতে তো ধরবে না। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি, আমাদের ড্রাইভার কাছাকাছি থানা থেকে আর-একটা গাড়ি নিয়ে আসুক। ততক্ষণ আমাদের এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও, দাঁড়াও, ব্যস্ত হয়ো না। এই পাখিগুলো যে তোমরা আটক করবে, তারপর থানায় নিয়ে গিয়ে কী হবে? পাখিগুলোকে কি থানার লোকেরা দানাপানি খাওয়াবে?

তপন বলল, ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার নিতে হবে। তারপর গুয়াহাটির চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দিলে ওরা যা তোক ব্যবস্থা করবে।

কাকাবাবু বললেন, গভর্নমেন্টের তো আঠারো মাসে বছর। এগুলো নিয়ে গিয়ে থানায় রাখবে। ম্যাজিস্ট্রেটের অর্ডার পেতে কতদিন লাগবে কে জানে! তারপর গুয়াহাটি চিড়িয়াখানায় পাঠাতে পাঠাতে অর্ধেক পাখি মরে যাবে না? ঠিক করে বলো!

তপন মাথা চুলকোতে-চুলকোতে বলল, তা হয় সার, অনেক সময় দেরি হয়ে যায়!

কাকাবাবু এবার কড়াভাবে বললেন, বিদেশে পাখি চালান দেওয়া যেমন অন্যায়, তেমনই তোমাদের অযত্নে পাখিগুলো মেরে ফেলা আরও বেশি অন্যায়। সব পাখি এখান থেকেই ছেড়ে দাও!

তপন বলল, সে কী বলছেন সার? তা হলে যে জলিলের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ থাকবে না!

কাকাবাবু বললেন, পাখিগুলোকে বাঁচানোই তো বড় কথা, তাই না? নাও, নাও, শুরু করো, খাঁচাগুলোর দরজা খুলে দাও!

সন্তু আর জোজো মহা উৎসাহে এই কাজে লেগে গেল। এক-একটা খাঁচা খোলা হয় আর ফরফর করে উড়তে থাকে পাখি। সব পাখি তখুনি উড়ান দিয়ে মিলিয়ে যায় না। হঠাৎ মুক্তি পেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কিছু পাখি উঠোনে হেঁটে বেড়ায়, কিছু পাখি সুপুরি গাছগুলোতে বসে ডাকতে শুরু করল। ছোট পাখিগুলো একসঙ্গে ঝাঁক বেঁধে উড়তে লাগল মাথার ওপরে।

কাকাবাবু মুগ্ধভাবে এই পাখি ওড়ার দৃশ্য দেখতে লাগলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হয়, এমন সুন্দর দৃশ্য যেন তিনি বহুদিন দেখেননি।

তিনি ফিরোজাকে বললেন, তুমিও পাখি ওড়াবে? যাও না!

ফিরোজা এবার দৌড়ে গিয়ে সন্তুদের পাশে গিয়ে হাত লাগাল।

সমস্ত পাখি মুক্তি পাওয়ার পর কাকাবাবু আবার ফিরোজাকে ডেকে বললেন, আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে, তুমি আমাকে একটু পানি খাওয়াবে?

ফিরোজা ঘরের মধ্যে গিয়ে একটা ঝকঝকে পেতলের ঘটি ভর্তি জল আর একটা কাচের গেলাস নিয়ে এল। কাকাবাবুর পর সন্তু-জোজোরাও সেই জল খেল।

কাকাবাবু ফিরোজাকে বললেন, পাখিগুলো ছাড়া পেয়ে গেল, তাই তোমার বাবাকেও কেউ ধরে নিয়ে যাবে না। এবার থেকে তোমার বাবা পাখি ধরে আনলে তোমরা নিজেরাই খাঁচা খুলে ছেড়ে দেবে, কেমন? তোমার মাকে, অন্যদেরও সেই কথা বোলো। মনে থাকবে তো?

৩. বিকেলের দিকে বাতাস

বিকেলের দিকে বাতাস এমন ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে, বাগানে আর বসা যায় না। ডাকবাংলোর তিন দিকে রয়েছে চওড়া ঢাকা বারান্দা। সেখানে চাদরমুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে চেয়ারে বসেছে সন্তু আর জোজো। কাকাবাবু ওভারকোট পরে নিয়েছেন। একবার চা, একবার কফি পান করা হয়ে গেছে। জোজো গল্প বলে যাচ্ছে অনবরত।

একসময় জোজো সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, তুই কখনও কোনও পাখির পিঠে চেপেছিস?

সন্তু বলল, পাখির পিঠে? না তো! অতবড় কোনও পাখি আছে নাকি?

জোজো বলল, কেন! উটপাখি! আমি সেই পাখিতে চেপে গেছি অনেকটা দূর!

সন্তু বলল, উটপাখি? অস্ট্রিচকে বাংলায় বলে উটপাখি। কিন্তু উটপাখি তো ভাই পাখি নয়। চিংড়িমাছ যেমন মাছ নয়, বনমানুষ মানুষ নয়, ঘোড়ার ডিম ডিম নয়, ডুমুরের ফুল ফুল নয়...

কাকাবাবু একটু বই পড়ছিলেন, বই সরিয়ে হাসিমুখে তাকালেন। জোজো সঙ্গে এলে সময়টা বেশ ভালই কাটে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, জোজো, তুমি উটপাখির পিঠে কোথায় চেপেছিলে?

জোজো অম্লান বদনে বলল, বাবার সঙ্গে যখন সাউথ আমেরিকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, কী যেন দেশটার নাম, উরুগুয়ে বোধ হয়, সেখানে...

সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বাধা দিয়ে বলল, ধ্যাত! অস্ট্রিচ শুধু আফ্রিকা ছাড়া আর কোথাও পাওয়াই যায় না!

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন জোজোর দিকে। তারপর বললেন, জোজোর কথাটা অত সহজে উড়িয়ে দিতে পারবি না রে সন্তু। দক্ষিণ আমেরিকাতেও উটপাখির মতনই প্রায় একটা প্রাণী আছে, তার নাম রিয়া। উড়তে পারে না বটে, কিন্তু দারুণ জোরে ছোটে। আর্জেন্টিনায় আমি দেখেছি। পিঠে আর পেছন দিকে অনেক বড় বড় পালক থাকে, আর ডিম পাড়ে বলে ওদের পাখি বলেই ধরা হয়।

জোজো বলল, ডিম পাড়লে পাখি হবে না কেন? উটপাখিও ডিম পাড়ে। সেইজন্যই ওরাও পাখি।

সন্তু বলল, ডিম পাড়লেই বুঝি পাখি হয়? কচ্ছপও তো ডিম পাড়ে, তা হলে কচ্ছপও পাখি? পাখি মানে খেচর, যারা আকাশে ওড়ে।

কাকাবাবু বললেন, ওই রিয়াগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা আর কোনও পাখি বা প্রাণীর নেই। মেয়ে রিয়াগুলো ডিম পাড়ে, ডিম পেড়েই তারা চলে যায়, আর কোনও খবরই রাখে না। পুরুষ রিয়াগুলো সেই ডিম পাহারা দেয়, তা দিয়ে ফোটায়, বাচ্চাদের বড় করে তোলে। বাবা হিসেবে এমন দায়িত্ববান আর দেখা যায় না।

জোজো বলল, আমি ওই পুরুষ রিয়ার পিঠেই চেপেছি।

সন্তু বলল, ঠিক করে বল তো, তুই সত্যি-সত্যি চেপেছিস, না কোনও ছবিতে দেখেছিস?

কাকাবাবু ওদের তর্ক থামিয়ে দিয়ে বললেন, আচ্ছা, ঘোড়ার ডিম কথাটা লোকে কেন বলে? গরুর ডিম, মোষের ডিম তো বলে না?

জোজো বলল, এককালে পক্ষিরাজ ঘোড়া ছিল, তাদের ডানা ছিল, আকাশে উড়ত। ওই যে সন্তু খেচর না মেচর কী বলল, তাই-ই ছিল। সেই পক্ষিরাজ ঘোড়া নিশ্চয়ই ডিম পাড়ত!

সন্তু বলল, কোনও এক জন্মে জোজো রাজপুত্র ছিল, তখন ও পক্ষিরাজ ঘোড়ার পিঠেও চেপেছে।

জোজো বলল, হতেও পারে। আমি মাঝে-মাঝে স্বপ্নে আমার আগের জন্মগুলো দেখতে পাই। ঠিক আগের জন্মে আমি ছিলাম আর্মির একজন কর্নেল।

কাকাবাবু বললেন, ওই দ্যাখো, ওই ঘোড়াটা বোধ হয় কোনও এক জন্মে পক্ষিরাজ ছিল!

ওরা দু জনেই চমকে মুখ ফেরাল।

সত্যি-সত্যি ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক ঢুকছে বাগানে। ঘোড়াটার রং কুচকুচে কালো, দেখলেই মনে হয় খুব তেজি। কাছে এসে ঘোড়াটা থেকে নামল তার আরোহী, এত শীতেও সে শুধু একটা নীল রঙের শার্ট আর জিন্স পরা। মাথায় একটা কাপড়ের টুপি। লোকটির চেহারা চোখে পড়বার মতন। গায়ের রং কালো, ছিপছিপে লম্বা, শরীরে একটুও মেদ নেই, খুব ভাল খেলোয়াড়দের মতন। ওর চোখের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী।

লোকটি দু হাত তুলে কাকাবাবুকে বলল, নমস্কার। আপনিই তো মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী? আপনাদের আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, কোথায়?

লোকটি বলল, আপনাদের চায়ের নেমন্তন্ন আছে। হিম্মত রাও আপনাদের আজ নেমন্তন্ন করেছেন।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, তিনি নেমন্তন্ন করেছেন বটে, কিন্তু আমরা আজই যাব তো বলিনি। আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে।

লোকটি বলল, হিম্মত রাওয়ের ধারণা, আপনারা আজই যাবেন, তিনি চা-টা টেবিলে সাজিয়ে বসে আছেন।

কাকাবাবু বললেন, দুঃখিত। ওই যে বললাম, আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। আজ আর বেরোতে ইচ্ছে করছে না।

লোকটি বলল, ও! আপনারা যাবেন না! ঠিক আছে। নমস্কার।

আর একটিও কথা বাড়াল সে। খুব সাবলীলভাবে ঘোড়ায় উঠে পড়ল। তারপর সোজাসুজি গেটের দিকে না গিয়ে বাগানের মধ্যে ছোটাতে লাগল ঘোড়াটাকে। ক্রমশই গতিবেগ বাড়াচ্ছে। ঘোড়ার পায়ের চাপে তছনছ। হয়ে যাচ্ছে অনেক ফুল গাছ। তারপর একসময় প্রচণ্ড জোরে লাফ দিল ঘোড়াটা, বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে অন্যদিকে চলে গেল।

কাকাবাবু বললেন, বাপ রে, লোকটা দারুণ ঘোড়া চালায় তো!

সন্তু বলল, হিম্মত রাওয়ের সঙ্গীরা সবাই কি অভদ্র? লোকটা নিজের নামও বলল না!

জোজো বলল, অভদ্র ব্যবহার তো কিছু করেনি। জোরাজুরিও করেনি। আমরা যাব না শুনেই চলে গেল।

সন্তু বলল, কাকাবাবুর সামনে শুধু-শুধু বাগানের মধ্যে ঘোড়া চালাবার কেরানি দেখাবার কী মানে হয়? কতগুলো ফুলগাছ নষ্ট করে দিল। যারা গাছ নষ্ট করে, তাদের আমি কিছুতেই ভাল লোক মনে করি না।

কাকাবাবু বললেন, যাই বলিস, এমন চমৎকার স্বাস্থ্যবান লোক আজকাল দেখাই যায় না। কী সুন্দরভাবে ঘোড়াটায় চাপল!

একটু বাদেই নিজে জিপ চালিয়ে চলে এল তপন রায় বর্মণ। মুখে-চোখে অস্থির ভাব।

সে বলল, কাকাবাবু, আপনারা হিম্মত রাওয়ের বাড়ি চা খেতে গেলেন না? আপনাদের জন্য তো স্টেশান ওয়াগনটা রয়েছেই, ওতে চলে গেলে পারতেন!

কাকাবাবু বললেন, একজন ডাকতে এসেছিল, আমরা যাব না বলে দিয়েছি।

তপন বলল, কিন্তু হিম্মত রাও যে রেডি হয়ে বসে আছে আপনাদের জন্য। না গেলে খুব অসন্তুষ্ট হবে। চলুন, চলুন!

কাকাবাবু বললেন, কী মুশকিল, ইচ্ছে না করলেও যেতে হবে নাকি! জোর-জবরদস্তি করে নেমন্তন্ন?

তপন শুকনো মুখে বলল, হিম্মত রাও আমার কাছে খবর পাঠাল, আপনাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। সব দোষটা আমার ঘাড়ে পড়বে। তারপর যদি আমার পেছনে লাগে!

কাকাবাবু সন্তু আর জোজোর মুখের দিকে তাকালেন। ওরা দুজনেই মাথা নাড়ল। চাদর জড়িয়ে আরাম করে বসেছে, এখন আর ওদের যাওয়ার ইচ্ছে নেই একটুও।

কাকাবাবু তপনকে বললেন, বোসো, বোসো, একটু বোসো। আমাদের যে ডাকতে এসেছিল, সে কে বলো তো?

তপন একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল, কে এসেছিল? কী রকম চেহারা?

কাকাবাবু বললেন, ঘোড়ায় চেপে এসেছিল, কালো, লম্বা, খুব চমৎকার স্বাস্থ্য, বয়স হবে পঁয়তিরিশ-ছত্রিশ।

তপন বলল, ও বুঝেছি। টিকেন্দ্রজিৎ! সে নিজে এসেছিল?

কাকাবাবু বললেন, টিকেন্দ্রজিৎ কে? হিম্মত রাওয়ের কর্মচারী?

তপন বলল, না, না, কর্মচারী নয়, বন্ধু বলতে পারেন। টিকেন্দ্রজিৎ তো এখানে থাকে না। মাঝে-মাঝে আসে। তখন হিম্মত রাওয়ের বাড়িতে ওঠে। তাই তো অবাক হচ্ছি, সাধারণ একজন কর্মচারীর মতন টিকেন্দ্রজিৎ নিজে ডাকতে এসেছিল আপনাদের?

কাকাবাবু বললেন, সে যে সাধারণ নয়, তা সে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। এখানে থাকে না তো কোথায় থাকে?

তপন বলল, তা ঠিক জানি না। লোকটা দুর্ধর্ষ শিকারি ছিল শুনেছি। বন্দুক চালায়, তলোয়ার খেলতে জানে, অনেক রকম খেলাধুলো জানে। ওর পুরো নাম রাজকুমার টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ। মনে হয়, মণিপুরের লোক। রাজকুমার মানে সত্যি-সত্যি রাজপুত্র নয়, মণিপুরিরা অনেকেই রাজকুমার লেখে নামের আগে।

সন্তু বলল, মণিপুরিরা কালো হয়?

তপন বলল, না, বেশির ভাগই ফরসা, তবে দু-চার জন কালোও হয়। এই টিকেন্দ্রজিৎ ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতেই ভালবাসে। বোধ হয় ওর মা ছিল বাঙালি।

সন্তু বলল, আমি লক্ষ করেছি, হিম্মত রাওয়ের মতন ওর গলাতেও একটা সোনার চেন আছে। তবে তাতে হনুমানের বদলে একটা বাঘের মুখের ছবি।

তপন বলল, মনে হয়, ও আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিল।

কাকাবাবু বললেন, তা হলে একবার ঘুরেই আসা যাক। কী রে, তোরা যাবি নাকি?

সন্তু প্রতিবাদের সুরে বলল, হিম্মত রাও ডেকে পাঠালেই আমাদের যেতে হবে?

কাকাবাবু বললেন, ওই টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে আমার আলাপ করতে ইচ্ছে করছে। লোকটা ইন্টারেস্টিং। তোরা বরং তা হলে থাক।

তপন বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওদের জামাকাপড় পরতে আবার সময় লাগবে। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আপনিই চলুন!

কাকাবাবু তপনের জিপে গিয়ে উঠলেন।

হিম্মত রাওয়ের বাড়িটা দেখবার মতন কিছু নয়। বড় বাড়িও নয়, একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে অনেক ছোট-ছোট বাড়ি ছড়ানো। এরই মধ্যে রয়েছে কাঠের গোলা, ধানের গোলা, গোয়ালঘর, তিনখানা গাড়ির গ্যারাজ, এক-উঠোন কাঁচালঙ্কা ও বেগুন গাছ। বড়বড় দুটো কুকুর ঘুরছে।

গাড়ি থেকে নামতেই একজন লোক ওদের নিয়ে গেল ভেতরের দিকের একটা বাড়িতে। পুরনো আমলের মোটা-মোটা সোফা দিয়ে সাজানো একটা বসবার ঘর। একপাশে একটা গোল শ্বেতপাথরের টেবিল। তার ওপর নানারকম বাসনপত্রে অনেক খাবার সাজানো। একটা সিংহাসনের মতন বিশাল চেয়ারে বসে আছে মানুষপাহাড় হিম্মত রাও। থুতনিতে এক হাত দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

কাকাবাবুর দিকে সে মনোযোগই দিল না, নমস্কারও করল না, তপনকে বলল, আমি এখনও চা খাইনি। তোমরা না এলে আমি চা খেতামই না। রাত্রেও কোনও খানা খেতাম না।

কাকাবাবুর মজা লাগল। এত বড় চেহারার মানুষটা ঠিক যেন বাচ্চা ছেলের মতন অভিমান করে আছে।

তিনি ভদ্রতা করে বললেন, আমাদের মাফ করবেন, হিম্মত রাও সাহেব। আজই যে আপনার এখানে আসতে হবে, তা আমি বুঝতে পারিনি। ছি ছি ছি, আপনার চা খেতে দেরি হয়ে গেল!

হিম্মত রাও এবারও কাকাবাবুর কথা গ্রাহ্য না করে হুঙ্কার দিয়ে উঠল, রামলখন, ঝগরু!

সঙ্গে-সঙ্গে দুজন লোক হাজির হল দুদিক দিয়ে।

হিম্মত রাও তাদের দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, বাতি জ্বালিসনি কেন ঘরের? চায়ের পট নিয়ে আয়।

এর পর সে উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুর কাঁধে একটা নতুন সুদৃশ্য গামছা পরিয়ে দিল। একটা প্লেটে করে এগিয়ে দিল কয়েকটি গুয়া বা কাঁচা সুপুরি। অসমের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে অতিথিদের যে গামছা ও সুপুরি দিয়ে বরণ করা হয়, তা জানেন কাকাবাবু। তিনি একটা সুপুরি মুখে দিলেন, কামড়ালেন না বা চুষলেন না। অভ্যেস না থাকলে কাঁচা সুপুরি খেলে মাথা ঘোরে।

এবার হিম্মত রাও নম্র গলায় বললেন, দয়া করে বসুন। গরিবের বাড়িতে সামান্য কিছু গ্রহণ করুন।

তারপরই তপনের দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বললেন, আর পাঁচ মিনিট দেরি হলে সব কিছু ছুঁড়ে ফেলে দিতাম!

কাকাবাবু বললেন, ওকে বকছেন কেন? বললাম তো, দোষ আমারই!

হিম্মত রাও বলল, না, না, আপনার দোষ হবে কেন? আপনি বিখ্যাত লোক, আপনার সব কথা মনে না থাকতে পারে। কিন্তু এই অতি চালাক বাঙালিটা কেন আপনাকে ঠিক সময় মনে করিয়ে দেয়নি? আপনার সঙ্গের ছেলেদুটো কোথায়?

কাকাবাবু বললেন, তারা আর আসতে চাইল না। বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে তো!

হিম্মত রাও বলল, তা হলে এত খাবার খাবে কে? সব টিফিন কেরিয়ারে ভরে দেব। ডাকবাংলোয় নিয়ে যাবেন! ওদের খেতে হবে।

কাকাবাবু একটা চেয়ার টেনে বসে টেবিল থেকে একটা বরফি তুলে নিয়ে মুখে দিলেন। মাথা নাড়তে-নাড়তে বললেন, বাঃ, ভারী ভাল স্বাদ। আপনার বন্ধুটি কোথায়!

হিম্মত রাও বলল, কোন বন্ধু!

কাকাবাবু বললেন, রাজকুমার টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ, যিনি আমাদের ডাকতে গিয়েছিলেন?

হিম্মত রাও বলল, টিকেন্দ্রজিৎ? সে চলে গেছে। সে কখন আসে, কখন যায়, কোনও ঠিক নেই। ঝড়ের মতন আসে, যায়। টিকেন্দ্রজিৎ আর তার ঘোড়া, বেশিক্ষণ এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারে না।

উনি কোথায় থাকেন?

তা জানার কী দরকার আপনার?

ও, না, না, কোনও দরকার নেই। এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।

মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি তেজপুরে বেড়াতে এসেছেন?

হ্যাঁ। তাতে আপনার আপত্তি আছে?

আপত্তি থাকবে কেন? কাজিরাঙ্গা জঙ্গল দেখতে গেলে সবাই গুয়াহাটি থেকে সোজা জঙ্গলেই চলে যায়, সেখানে ভাল থাকার জায়গা আছে। তেজপুরে সাধারণত কেউ থাকে না।

এরকম ছোট-ছোট শহর দেখতে আমার ভাল লাগে।

বেশ, আপনি আমাদের অতিথি। আমি গাড়ির ব্যবস্থা করব, যেখানে ইচ্ছে ঘুরে আসবেন, সঙ্গে খাবারদাবার থাকবে।

ধন্যবাদ, হিম্মত রাও সাহেব। কিন্তু সে সবের কোনও দরকার হবে না।

কেন?

কারণ, আমি আপনার অতিথি নই। বনবিভাগের অতিথি। ওঁরাই সব ব্যবস্থা করবেন। তাই না তপন?

তপন রায় বর্মণ মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। মিস্টার বড়ঠাকুর সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

চা এসে গেছে। কাকাবাবু এক চুমুক দিয়ে বললেন, বাঃ, তেজপুরে এসে এই প্রথম ভাল চা খেলাম। জানেন তো, আমরা বাঙালিরা দার্জিলিং চা খাই। অসমের চায়ের স্বাদ অন্য রকম।

হিম্মত সিং অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, দার্জিলিংয়ের চা আবার চা নাকি? শুধু গন্ধ! লিকার হয় না। আমাদের অসমের চা-ই বেশি ভাল। শুনুন মিস্টার রায়চৌধুরী, সরকারি গাড়ি আপনাকে শুধু বাঁধাধরা জায়গায় নিয়ে যাবে। যেখানে সবাই যায়। আমার গাড়ি আপনাকে অনেক ভেতরে নিয়ে যেতে পারে, ইচ্ছে করলে আপনি হরিণ-টরিন শিকারও করতে পারবেন।

কাকাবাবু বললেন, আপনাকে আবার ধন্যবাদ। আমি শিকার করি না। নিরীহ জন্তুদের গুলি করে মেরে আমি কোনও আনন্দ পাই না।

হিম্মত রাও হা-হা করে হেসে উঠে বলল, এই আপনাদের একটা নতুন বাতিক হয়েছে। শিকার বন্ধ। কেন বন্ধ? জন্তু-জানোয়াররা মানুষকে কামড়ায় না? মানুষ মারে না?

কাকাবাবু বললেন, আপনাকে যদি একটা বাঘ তেড়ে আসে, আপনি নিশ্চয়ই সেটাকে মারতে পারেন। আপনার বাড়িতে যদি হঠাৎ একপাল হাতি চলে আসে, আপনি গুলি চালাবেন অবশ্যই। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে যেসব বাঘ আর হাতি ঘুরে বেড়াচ্ছে, কারও কোনও ক্ষতি করছে না, লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের মারার মধ্যে কোনও বীরত্ব নেই। পৃথিবী থেকে তা হলে একদিন সব বাঘ আর হাতি-টাতি শেষ হয়ে যাবে!

হিম্মত রাও আবার হেসে বলল, বাঘ আর হাতি! হা-হা-হা, বাঘ আর হাতি! অসমে বাঘ আর হাতি অনেক আছে, শেষ হবে না। আপনি এখানে কতদিন থাকবেন?

কাকাবাবু বললেন, দু-তিন দিন। আচ্ছা, তা হলে এবার উঠি হিম্মতবাবু? আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলাম।

কাকাবাবু উঠে দাঁড়াতেই হিম্মত রাও কাছে এসে তার গদার মতন একখানা হাতে কাকাবাবুর কাঁধে একটা চাপড় মেরে বলল, ভাল করে সব ঘুরে দেখুন। আপনি আজ সন্ধেবেলা না এলে খুব দুঃখ পেতাম।

তারপর তপনের পিঠে একটা গুঁতো মেরে বলল, এই তপনবাবু, সাহেবের ভাল করে যত্ন নেবে। আমাদের তেজপুরের অতিথি!

হিম্মত সিং দাঁড়িয়ে রইল দরজার কাছে। কাকাবাবুরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন নীচে। গাড়ির কাছে এসে কাকাবাবু কাঁধে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ওফ, শুধু হাতখানা রেখেছে, তাতেই যেন আমার কাঁধ ভেঙে যাচ্ছিল।

তপন ককিয়ে উঠে বলল, আর আমার পিঠে...আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছি না।

কাকাবাবু বললেন, ওর গায়ে কতটা জোর, তা বুঝিয়ে দিল।

একজন তোক সত্যি সত্যি দুটি টিফিন কেরিয়ারে ভর্তি করে খাবারগুলো নিয়ে আসছে গাড়িটার দিকে।

কাকাবাবু মাথা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বাড়িটা দেখতে লাগলেন। হিম্মত সিংয়ের যে অনেক টাকা আছে, তা বোঝা যায়। কিন্তু রুচি নেই। সবই কেমন যেন এলোমেলো। এখানে কোনও কিছু লুকিয়ে রাখাও সহজ। পুলিশ এবাড়ি সার্চ করতে এলেও সহজে কিছু খুঁজে পাবে না।

কাকাবাবু আফসোস করে বললেন, টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে দেখা হল না!

ঠিক সেই সময় ঘোড়ার পায়ের খটাখট আওয়াজ হল। প্রচণ্ড জোরে রাস্তা থেকে ঘোড়া চালিয়ে উঠোনে ঢুকে এল টিকেন্দ্রজিৎ। ঠিক যেন ঝড়ের মতন। শেষ মুহূর্তে সে ঘোড়ার রাশ টেনে থামাল, ঘোড়াটা সামনের দু পা তুলে চি হি হি হি করে ডেকে উঠল। এক লাফ দিয়ে নামল টিকেন্দ্রজিৎ।

তপন জিপে উঠে পড়েছে, কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন এক পাশে। টিকেন্দ্রজিৎ একবার তাকাল কাকাবাবুর দিকে। যেন চিনতেই পারল না। অহঙ্কারের সঙ্গে মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে চলে গেল গটগট করে।

৪. মিহিমুখ নামে একটা জায়গা

মিহিমুখ নামে একটা জায়গা থেকে হাতি নিতে হয়। এখনও ভোরের আলো পুরোপুরি ফোটেনি। আকাশের একদিক অন্ধকার, একদিক একটু লালচে-লালচে। শেষরাতে উঠে ব্রহ্মপুত্র নদ পেরিয়ে আসতে চমৎকার লেগেছে, কিন্তু শীত বড্ড বেশি। সন্তু আর জোজো সোয়েটারের ওপর কোট, গলায় মাফলার, হাতে গ্লাভস পরে তৈরি হয়ে এসেছে।

গাড়িতে আসবার সময় জোজো অনবরত গান গেয়েছে। আর সন্তুকে বারবার খোঁচা মেরে বলেছে, তুইও গান কর, গান কর। যদি টপ্পা শিখতে চাস, তা হলে এই শীতেই খুব ভাল শেখা যায়। আপনি-আপনি গলা কাঁপবে। এই দ্যাখ না, যাব না, যাব না- আ আ আ আ!

কাকাবাবু একসময় স্বীকার করেছিলেন, জোজো সত্যি গান জানে।

অন্য টুরিস্ট আজ বেশি নেই। কাকাবাবুদের জন্য মিহিমুখে দুটো হাতি আগে থেকে ঠিক করা আছে। তপন আসেনি, তার বদলে শচীন সইকিয়া নামে আর-এক জন অফিসার আজ ওদের দেখাশোনা করবে। লোকটি বেশ হাসিখুশি ধরনের।

জোজো বলেছিল বটে যে আফ্রিকায় তার পোষা হাতি ছিল, কিন্তু এখানে সে হাতির পিঠে চাপতে গিয়ে প্রথমবার গড়িয়েই পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। তাতে একটুও দমে না গিয়ে সে ঠোঁট উলটে বলল, আফ্রিকার হাতির সঙ্গে এখানকার হাতির তুলনাই হয় না। এখানকার হাতিগুলো ছোট-ছোট। এত ছোট হাতির পিঠে চড়া আমার অভ্যেস নেই। এ যেন ঘোড়ার বদলে গাধার পিঠে চড়া!

জোজো আর সন্তু বসল একটা হাতির পিঠে। আর-একটাতে কাকাবাবু আর শচীন সইকিয়ার ওঠার কথা, কিন্তু কাকাবাবু একটু দূরে একটা খড়ের ঘরের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। সেখানে একটা ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। সাধারণ গোড়া যেমন হয়।

কাকাবাবু শচীনকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই ঘোড়াটা কার?

শচীন বলল, রাধেশ্যাম বড়ুয়া এখানে কাজ করে, ওটা তার ঘোড়া। বিভাগের নয়, ওর নিজস্ব।

কাকাবাবু বললেন, সে কি ঘোড়াটা আমাকে ধার দেবে? আমি একটা কথা ভাবছিলাম। আমার এই দু বগলে ক্রাচ নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে খুব অসুবিধে হয়। উঁচুনিচু থাকলে আরও মুশকিল। কিন্তু ঘোড়ায় চেপে অনায়াসে ঘুরতে পারি।

শচীন বলল, এখন তো আমরা হাতির পিঠে যাচ্ছি। মাটিতে নামব না।

কাকাবাবু বললেন, কোথাও একটু নামার ইচ্ছেও তো হতে পারে। ওই রাধেশ্যাম বড়ুয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করুন না!

রাধেশ্যাম একজন মধ্যবয়স্ক মানুষ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। একসময় সে বোধ হয় মিলিটারিতে ছিল, শচীনের সামনে এসে জুতোয় খটাখট শব্দ করে স্যালুট দিল।

শচীন বলল, রাধেশ্যাম, তোমার ঘোড়াটা এই স্যারকে ব্যবহার করতে দেবে? ইনি আমাদের কনজারভেটর সাহেবের অতিথি।

রাধেশ্যাম কাকাবাবুর আপাদমস্তক চেয়ে দেখল। তারপর সন্দেহের সুরে বলল, আপনি ঘোড়া চালাতে জানেন?

কাকাবাবু বললেন, এককালে তো ভালই পারতাম। অনেক দিন অভ্যেস নেই। চেষ্টা করে দেখি?

রাধেশ্যাম ঘোড়াটা আনার পর কাকাবাবু ক্রাচ দুটো শচীনের হাতে দিয়ে একটু কষ্ট করেই ঘোড়াটার পিঠে চাপলেন। অচেনা আরোহী পেয়ে ঘোড়াটা পিঠ ঝাঁকাতে লাগল, কাকাবাবু দু হাঁটু দিয়ে চেপে রইলেন তার পেট। প্রথমে আস্তে-আস্তে কয়েক কদম যাওয়ার পর তিনি জোরে ছুটিয়ে দিলেন, মিনিট পাঁচেক পরে ফিরে এলেন জঙ্গল থেকে।

হেসে বললেন, এই তো বেশ পারছি। ঘোড়াটাও আমাকে চিনে গেছে, আর ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে না।

রাধেশ্যাম বলল, হ্যাঁ, আপনি চালাতে জানেন, বোঝা যাচ্ছে! নিয়ে যান ওকে!

কাকাবাবু উৎফুল্লভাবে বললেন, কোনওই অসুবিধে হচ্ছে না। ভাবছি এবার কলকাতায় ফিরে গিয়েও ঘোড়ায় চড়ব। নিজের জন্য একটা ঘোড়া কিনে নেব।

শচীন অন্য হাতিটিতে চাপল, কাকাবাবু চললেন ওদের পাশে পাশে। আকাশ এখন ভরে গেছে নীল আলোয়। জঙ্গলের অন্ধকার মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার মতন। শুরু হয়ে গেছে পাখির ডাক। প্রথমেই চোখে পড়ল দুটো বনমোরগ। সাধারণ মোরগের চেয়ে অনেক বড়, আর তাদের মাথায় আগুন রঙের ঝুঁটি। তীক্ষ্ণভাবে ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল এক গাছ থেকে আর-এক গাছে।

অনেক দূরে দেখা গেল গোটাকতক হরিণ। একটা সরু পথ তারা লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেল চোখের নিমেষে।

জোজো বলল, গণ্ডার দেখা যাবে না, গণ্ডার?

কাকাবাবু কাছে এসে ফিসফিস করে বললেন, ব্যস্ত হয়ো না, দেখতে পাবে! একদম কথা বলা চলবে না। আর শোনো, কোনও একসময় যদি আমরা আলাদা হয়ে যাই, তা হলে ঠিক করা রইল, ঠিক দু ঘণ্টা বাদে আমরা আবার মিহিমুখে ফিরে আসব।

শচীন বলল, বাঘ সম্পর্কে সাবধান থাকবেন, স্যার। ঘোড়া দেখলে বাঘ আসে। হাতির পিঠে থাকলে সে-ভয় নেই।

হাতি চলেছে দুলকি চালে। মাঝে-মাঝে হাতি দুটো থেমে পড়ে কোনও গাছের ডাল ভাঙছে। ঘোড়া এত ধীর গতিতে চলতে পারে না। কয়েকবার কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন খানিকটা, আবার ফিরে এলেন।

তারপর এক সময় ওদের কিছু না জানিয়ে ইচ্ছে করেই তিনি চলে গেলেন অন্য দিকে।

এবার বেশ জোরে যেতে লাগলেন তিনি। অনেক দিন পর ঘোড়া চালিয়ে তাঁর খুব আনন্দ হচ্ছে। বয়সটা যেন কমে গেছে হঠাৎ। ঘোড়ার পিঠে একা-একা কিছুক্ষণ ছুটলেই নিজেকে যেন একজন যোদ্ধা মনে হয়। আগেকার আমলের যোদ্ধা। মাথায় পাগড়ি আর কোমরে তলোয়ার থাকলে মানায়।

প্রথম রাত্তিরে যেখানে গিয়েছিলেন কাকাবাবু, সেই জলাশয়টা খুঁজতে লাগলেন। খুব অসুবিধে হল না, মাঝে-মাঝে জিপ গাড়িটার চাকার দাগ চোখে পড়ছে। কোথাও-কোথাও গাছের ডাল কেটে জিপটাকে এগোতে হয়েছিল, সেই সব ডাল পড়ে আছে মাটিতে। এইসব চিহ্ন অনুসরণ করতে করতে ঝিলটার কাছে পৌঁছে গেলেন কাকাবাবু।

ক্রাচ দুটো আনেননি, তাই ঘোড়া থেকে নামলেন না।

সেই রাত্তিরে এই জায়গাটা কত রোমাঞ্চকর মনে হয়েছিল, এখন সকালের আলোয় আর সে রকম কিছু মনে হয় না। ঝিলটার জল বেশ কমে গেছে, মাঝখানে ফুটে আছে লাল শালুক। একঝাঁক বালিহাঁস জলে ভাসছিল, ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেয়েই সবাই মিলে ঝটপটিয়ে উড়ে গেল।

জলের ধারে ধারে নরম মাটিতে অনেক রকম জন্তুর পায়ের দাগ।

কাকাবাবু যে-জায়গাটায় পড়ে গিয়েছিলেন সে-জায়গাটাও খুঁজে পেলেন। সেখানকার মাটি ছেয়ে আছে কাঁটাঝোপে, বেশ বড়বড় কাঁটা। ভাগ্যিস, চোখে বিধে যায়নি। সেই কাঁটাঝোপে আবার ছোট্ট-ছোট্ট হলুদ ফুল ফুটেছে।

ঘোড়াটা নিয়ে কাকাবাবু ঘুরতে লাগলেন ঝিলটার চারপাশে। দিনের বেলা জন্তু-জানোয়াররা জল খেতে আসে না। সারাদিন কি ওদের তেষ্টা পায় না?

অনেকটা ঘোরার পর কাকাবাবু এক জায়গায় একটা কাচের বোতল দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। এত দূরে টুরিস্টদের আসতে দেওয়া হয় না। চোরাশিকারিরাই তা হলে এই বোতলটা ফেলে গেছে। কাছেই একটা পাথরের দেওয়ালের মতন। কোনও এক সময় কেউ এখানে একটা ঘর বানিয়েছিল মনে হয়, এখন এই একটা দেওয়াল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

সেই দেওয়ালের পেছন দিকটায় গিয়ে কাকাবাবু দেখলেন, সেখানে দু-একটা পাউরুটির টুকরো, মুরগির মাংসের হাড়, ছেঁড়া খবরের কাগজ পড়ে আছে। চোরাশিকারিরা এখানে অনেকক্ষণ সময় কাটায় বোঝা যাচ্ছে। এখানে বসে খাওয়াদাওয়া করে। দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকা যায়।

আবার ঝিলের দিকে এসে কাকাবাবু দেখলেন, সেই কাঁটা ঝোপের জায়গাটা থেকে এই দেওয়ালটা খুব দূরে নয়। তিনি এখন উলটো দিক দিয়ে ঝিল ঘুরে এসেছেন। সেই রাত্রে এই দেওয়ালটার বেশ কাছে এসে পড়েছিলেন। সেইজন্যই চোরাশিকারিরা তাঁর দিকে গুলি ছুড়েছিল। তাঁকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল, না ভয় দেখাতে চেয়েছিল শুধু?

কাকাবাবুর ঘোড়াটা ঝিলের কাছে গিয়ে চকচক করে জল খেয়ে নিল খানিকটা। ঘোলাটে জল, ভেতরে আবার শ্যাওলা জমে আছে। কাকাবাবু ভাবলেন, এই নোংরা জল খেতে মানুষের ঘেন্না হয়, জন্তু-জানোয়াররা তো দিব্যি খেয়ে নেয়। তাদের অসুখও করে না।

হঠাৎ ঝিলের অন্য পারে গাছপালার মধ্যে যেন তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। কাকাবাবু তাড়াতাড়ি ঘোড়াটাকে পিছিয়ে নিয়ে কয়েকটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়ালেন। কারা যেন আসছে। একটু পরেই বোঝা গেল, মানুষ নয়, আসছে হাতির পাল। ঝোপঝাড় ভেদ করে বেরিয়ে এল তিনটে বড় হাতি আর একটা বাচ্চা। তারা হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল ঝিলে। এই শীতে জল খুবই ঠাণ্ডা,

ওদের কি শীত করে না?

বোঝা গেল, ওরা স্নান করতে এসেছে। শুড় দিয়ে জল তুলে ফোয়ারার মতন ছিটিয়ে দিচ্ছে এক জন আর-এক জনের গায়ে। কাকাবাবু এ রকম দৃশ্য আগে দেখেননি। বাচ্চাটাকে নিয়ে খেলছে তিনটে বড় হাতি।

অন্য জন্তু-জানোয়ার দিনের বেলা আড়াল ছেড়ে বেরোতে ভয় পায়, কিন্তু হাতির কোনও ভয়ডর নেই। বাঘও সব সময় আড়ালে থাকতেই পছন্দ করে। হাতি কাউকে গ্রাহ্য করে না।

কিছুক্ষণ হাতিদের জলকেলি দেখার পর কাকাবাবু আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

মিহিমুখে সন্তুরা তখনও ফিরে আসেনি। রাধেশ্যামকে ঘোড়াটা ফেরত দিয়ে কাকাবাবু তার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। রাধেশ্যাম তার এই ঘোড়াটার জন্য খুব গর্বিত। এর নাম রেখেছে সে রণজিৎ। এ ঘোড়া যে-কোনও লোককে তার পিঠে সওয়ার হতে দেয় না, ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলে দেয়। কাকাবাবুকে রণজিতের নিশ্চয়ই পছন্দ হয়েছে।

কাকাবাবু রাধেশ্যামকে কিছু টাকা দিতে চাইলেন, সে কিছুতেই নিল না। সে বলল যে, কাকাবাবু ইচ্ছে হলে আবার রণজিৎকে নিতে পারেন যে-কোনও

দিন।

সন্তু আর জোজো ফিরে এল তর্ক করতে করতে।

সন্তু দেখতে পেয়েছে গোটা পাঁচেক গণ্ডার, একপাল বুনো শুয়োর, শম্বর আর বুনো মোষ। হরিণ তো অনেক।

জোজো বলল, সে আরও বেশি দেখেছে। সে ওগুলো ছাড়াও দেখেছে বাঘ আর পাইথন।

সন্তু বলল, মোটেই তুই বাঘ দেখিসনি। ওটা একটা হলদে মতন একটা ঝোপ।

জোজো বলল, আমি বাঘের মাথাটা দেখতে পেয়েছি, স্যাট করে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।

সন্তু বলল, তোর ক্যামেরায় ছবি তুললি না কেন?

জোজো বলল, ওরকম বাঘের ছবি আমাদের বাড়িতে কত আছে।

সন্তু বলল, তুই যেটা পাইথন বললি, সেটা একটা গাছের ভাঙা ডাল।

জোজো বলল, আমি বলছি, পাইথনটা চোখ পিটপিট করছিল।

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, যাক, মোট কথা, তোদের সফর খুব সাকসেসফুল। অনেক কিছু দেখেছিস। সবচেয়ে কোন্টা ভাল লাগল?

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, পাইথন। সন্তু ওটা দেখেনি!

সন্তু একটু ভেবে বলল, সবই ভাল লেগেছে। তবে সবচেয়ে বেশি ভাল লেগেছে ময়ূর। আমি আগে কখনও ময়ূরকে উড়তে দেখিনি। অতবড় লেজ নিয়ে উড়ে যায়, বেশ উঁচু গাছে বসে। রোদ্দুরে ওদের গায়ের রং ঝিলমিল করছিল।

দুপুরবেলা বাংলোতে ফিরে খাওয়াদাওয়া করেই ঘুম। আগের রাতে ভাল করে ঘুমই হয়নি। এখন সেটা পুষিয়ে নিতে হবে।

কাকাবাবু অবশ্য ঘুমোলেন না। দুপুরে তাঁর কিছুতেই ঘুম আসে না। তিনি বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসে রইলেন পা ছড়িয়ে। গায়ে রোদ লাগছে, তাতেও বেশ আরাম!

বিকেল হতেই কাকাবাবু ছেলে দুটিকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, চলো, চলো, এখন বেরুতে হবে। বেড়াতে এসে শুধু-শুধু ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয়!

টেলিফোন করতেই এ-বেলা স্টেশান ওয়াগনটা নিয়ে হাজির হল তপন। কাকাবাবু বললেন, চলল, ভালুকপং ঘুরে আসি।

তপন বলল, স্যার, ওদিকে তো যাওয়া যাবে না। ওদিকটা অরুণাচলে পড়ে যাচ্ছে। অসম ছেড়ে অরুণাচলে ঢুকতে হলে পারমিট লাগে। অবশ্য কালকেই আপনাদের জন্য পারমিট আনিয়ে দিতে পারি।

কাকাবাবু বললেন, অরুণাচলের ভেতরে ঢুকব না। ভালুকপং-এর নদীর ধার পর্যন্ত তো যাওয়া যায়। সেই জায়গাটাও খুব সুন্দর।

সন্তু বলল, ভালুকপং! ভালুকপং! নামটা বেশ মজার তো!

কাকাবাবু বললেন, ওখানকার নদীর নামটাও খুব সুন্দর, জিয়াভরলি। তার মানে হচ্ছে জীবন্ত নদী।

তেজপুর থেকে ভালুকপং প্রায় ষাট-সত্তর কিলোমিটার দূরে। পৌঁছতে-পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল।

নদীর ধারে পর্যটকদের থাকবার জন্য একটা নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। পেছন দিকে জঙ্গল। সব মিলিয়ে বেশ ছবির মতন।

গাড়ি থেকে নেমে নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে তপন বলল, অন্ধকার হয়ে গেছে, তাই নদীর জলের রং বোঝা যাচ্ছে না। দিনের বেলায় এ-নদীর জল সমুদ্রের মতন, নীল রঙের বলে মনে হয়।

কাকাবাবু বললেন, বেশ স্রোত আছে। সেই শব্দ শোনা যাচ্ছে, সেইজন্য রাত্তিরবেলাতেও নদীটাকে জীবন্ত মনে হয়।

সন্তু বলল, এই নদীতে সাঁতার কাটা যায়?

তপন বলল, খুব বিপজ্জনক। স্রোতে টেনে নিয়ে যেতে পারে। এইসব পাহাড়ি নদীর কখন যে জল বাড়ে, কিছু বলা যায় না।

জোজো বলল, তেজপুরের বাংলো থেকে এ-জায়গার বাংলোটা অনেক ভাল। আমরা এখানেই থাকতে পারি না?

তপন বলল, হ্যাঁ, ব্যবস্থা করা যায়। ভাগ্যে থাকলে বাংলোতে বসে বসেই দেখা যায় হাতির পাল নদীতে জল খেতে আসছে।

হঠাৎ নদীর জলে দারুণ জোর একটা শব্দ হল। এ-পার থেকে কে যেন জলে লাফিয়ে পড়েছে। ওরা দৌড়ে গেল সেই দিকটায়। আবছা আলোয় দেখা গেল, স্রোতের মধ্যে ঝপাঝপ শব্দ হচ্ছে, আর ঘোড়াসুন্ধু একজন মানুষ উঠছে আর নামছে। মানুষটি নিশ্চয়ই হঠাৎ পড়ে যায়নি, সে সাহায্যের জন্য চিৎকার করছে না। সে ঘোড়াসুদ্ধ নদী পার হতে চাইছে।

সন্তু বলল, বাবা, লোকটার তো দারুণ সাহস!

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, লোকটা কে? চেনো নাকি, তপন?

তপন বলল, নাঃ! ঠিকমতন তো দেখতেও পাচ্ছি না!

কাকাবাবু বললেন, টিকেন্দ্রজিৎ নাকি?

তপন বলল, হতেও পারে। একমাত্র তারই এমন সাহস হতে পারে। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ এখানে কেন আসবে?

কাকাবাবু বললেন, যদি আমাদের ফলো করে আসে, তা হলে এরকম অকারণ বীরত্ব দেখাবারই বা দরকার কী? অন্য কেউ হবে।

ওরা সবাই একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

সেই স্রোতের সঙ্গে লড়াই করতে করতে অশ্বারোহীটি একসময় পৌঁছে গেল নদীর ওপারে। সেখানে একটুও অপেক্ষা করল না, ঘোড়া চালিয়ে দিল তীরবেগে।

কাকাবাবু বললেন, চলো, এবার ফেরা যাক। কাল আমরা ওরাং জঙ্গল দেখতে যাব।

গাড়িতে ওঠার পর কাকাবাবু বললেন, এখানে যেমন জিয়াভরলি নদী, তেমনই ওরাং-এর একটা নদীর নাম ধানসিঁড়ি। সন্তু, এই নদীটার নাম কেন বিখ্যাত বলতে পারিস?

জোজো বলল, আমি পারি। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে।

কাকাবাবু বললেন, তাই নাকি? রবীন্দ্রনাথের সে লাইনটা কী শুনি?

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল :

সন্ধ্যা নামে ধীরে ধীরে
ধানসিঁড়ি নদীতীরে
পাখিগুলি ডানা ঝাপটায়!

কাকাবাবু বললেন, বাঃ বাঃ! তোমার তো বেশ মুখস্থ থাকে। তবে রবীন্দ্রনাথ যদি এরকম লাইন লিখে থাকেন, সেটা গবেষকদের কাছে একটা নতুন খবর হবে!

সন্তু বলল, কাকাবাবু, জোজো ওটা এইমাত্র বানাল, তুমি বুঝতে পারলে?

কাকাবাবু বললেন, তা হলেও তো বেশ ভালই বানিয়েছে! তুই এ রকম পারিস?

সন্তু বলল, আমি কবিতা বানাতে পারি না। কিন্তু আমি জানি, এই নদীর নাম আছে জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। কিন্তু চন্দ্রবিন্দু নেই, ধানসিড়ি।

আবার আসিব ফিরে
ধানসিড়িটির তীরে

এই বাংলায়।

কাকাবাবু বললেন, জোজোর কল্পনাশক্তি আছে বল? কল্পনাশক্তি না থাকলে কবি হওয়া যায় না!

সন্তু বলল, ওর সবটাই কল্পনাশক্তি।

তপন বলল, আমাদের পেছন পেছন কেউ ঘোড়ায় চেপে আসছে।

সবাই মুখ ফেরাল। আকাশে সামান্য জ্যোৎস্না, সেই অস্পষ্ট আলোয় দেখা গেল খুব জোরে কেউ একজন ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে, কপাকপ শব্দ হচ্ছে।

একটু পরেই সেই ঘোড়সওয়ার এসে গেল গাড়ির পাশাপাশি। কালো রঙের ঘোড়া, কালো রঙের পোশাক-পরা সওয়ার, মুখ না দেখতে পেলেও বোঝা যায় যে, সে টিকেন্দ্রজিৎ!

যদি সে হঠাৎ গুলি চালায়, সেইজন্য কাকাবাবু সবাইকে বললেন, মাথা নিচু করো, শুয়ে পড়ো!

টিকেন্দ্রজিৎ কিন্তু গুলিটুলি চালাল না, গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই যেন তার উদ্দেশ্য। গাড়ির পাশে-পাশে সমান গতিতে ছুটতে লাগল সে।

তপন বলল, ঘোড়া ছুটিয়ে গাড়ির সঙ্গে পারবে? দেখাচ্ছি মজা।

তপন আরও গতি বাড়াবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু বললেন, থামো, থামো, ওকে দাঁড় করাও। আমি টিকেন্দ্রজিতের সঙ্গে আলাপ করতে চাই। ও কী চায়, তা জানা দরকার।

তিনি জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বললেন, থামুন, থামুন, আমরাও থামছি!

তপন গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। টিকেন্দ্রজিৎ কাকাবাবুর কথা গ্রাহ্যই করল। একবার মাত্র মুখ ফিরিয়ে, সমান বেগে ছুটে গেল ধুলো উড়িয়ে। একটু পরে আর তাকে দেখা গেল না!

কাকাবাবু বললেন, আশ্চর্য ব্যাপার তো! লোকটা আমাদের আশেপাশে ঘুরছে। অথচ কথা বলতে চায় না!

জোজো বলল, রহস্যময় কালো অশ্বারোহী!

সন্তু বলল, তুই এই নামে একটা গল্প লিখে ফেল জোজো।

বাংলোয় ফিরতে ফিরতে রাত নটা বেজে গেল।

বারান্দায় বসে আছেন দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর আর রাজ সিং। দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন ওদের দেখে।

কাকাবাবু বললেন, কী ব্যাপার, মিস্টার বড়ঠাকুর? আপনি গুয়াহাটিতে ফিরে যাননি?

বড়ঠাকুর বললেন, কাল চলে গিয়েছিলাম। আজই ফিরতে হল একটা জরুরি খবর পেয়ে। মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি আমাকে আসল কথাটাই বলেননি?

কাকাবাবু দেখলেন, বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে আছে এই বাংলোর কেয়ারটেকার মন্টা সিং, পেছনের খাবারের ঘরে বসে একজন একটা বেতের চেয়ার সারাচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, এখানে নয়। আমার ঘরে চলুন, কথা হবে।

৫. বাংলোর দুখানা ঘরের মধ্যে

বাংলোর দুখানা ঘরের মধ্যে কাকাবাবুর ঘরটাই বেশি বড়। এক দিকে খাট ও লেখাপড়ার জন্য টেবিল-চেয়ার, অন্য দিকে কয়েকটি সোফা পাতা রয়েছে। খাটের দু পাশে বড় দুটি বাতিদান।

কাকাবাবুর সঙ্গে সবাই চলে এল এ-ঘরে।

দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর বললেন, অন্যরা পাশের ঘরে গল্প করুক বরং, আমি আর রাজ সিং আপনার সঙ্গে আগে জরুরি কথাগুলি সেরে নিই।

কাকাবাবু বললেন, সন্তু আর জোজো থাকতে পারে। ওদের বাদ দিয়ে তো আমার কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।

তপন নিজে থেকেই বলল, স্যার, আমি এখন বাড়ি যেতে পারি? আমার একটু কাজ আছে।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে, এখন যাও। পরে তোমাকে কাজে লাগবে। তুমি মণ্টা সিং-কে বলে যাও, আমাদের কয়েক কাপ চা দিয়ে যেতে।

তপন বেরিয়ে যাওয়ার পর দেবেন্দ্র বড়ঠাকুর দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলে দিলেন। তারপর সোফায় বসে বললেন, পশ্চিমবাংলার চিফ কনজারভেটর ডক্টর চক্রবর্তী আমাকে খবর পাঠিয়েছিলেন যে, আপনি আপনার ভাইপোদের নিয়ে অসমে বেড়াতে আসবেন, আমরা যেন সব ব্যবস্থা করে দিই। আমরা খুব আনন্দের সঙ্গে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু আমার মনে একটা সন্দেহ ছিল। আপনার মতন মানুষ কি শুধু বেড়াতেই আসবেন, অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই?

কাকাবাবু হেসে বললেন, ওই যে আপনি বলেছিলেন, চেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আসলে আমার এখন অসমে আসবারই কথা ছিল না, যাব ঠিক করেছিলাম গোয়ায়। ওই চক্রবর্তীরাই এখানে জোর করে পাঠাল।

বড়ঠাকুর বললেন, চক্রবর্তীরাও পাঠায়নি, আপনাকে পাঠাবার নির্দেশ ছিল দিল্লি থেকে। কাল গুয়াহাটি গিয়ে সব খবর পেলাম, দিল্লি থেকে আমাদের অনেক কিছু জানানো হয়েছে।

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, গণ্ডার।

জোজো বলল, আমি কাল পাঁচটা গণ্ডার দেখেছি!

সন্তু জোজোর উরুতে চিমটি কেটে বলল, চুপ কর না। নিশ্চয়ই শুধু দেখার কথা হচ্ছে না!

কাকাবাবু বললেন, শুধু গণ্ডার নয়। আসল হচ্ছে গণ্ডারের শিং!

জোজো বলল, গণ্ডারের আবার শিং থাকে নাকি? গোরু-মোষের শিং থাকে মাথার দুপাশে। আমি তো দেখলাম, গণ্ডারের নাকের ওপর উঁচুমতন কী যেন একটা!

কাকাবাবু বললেন, জোজো ঠিকই বলেছে। ইংরিজিতে বলে হর্ন, তাই আমরাও বলি শিং। আগে বাংলায় বলত খড়্গ। কিংবা খাঁড়া। গণ্ডারের নাকের ওপর খাঁড়া থাকে।

সন্তু বলল, আমি জানি, আসলে ওটা শিং বা খাঁড়া কিছুই নয়। গণ্ডার ওটা দিয়ে কাউকে তোতেও পারে না। ওটার মধ্যে শক্ত হাড়-টাড় নেই, লোমের

মতন জিনিস জট পাকিয়ে-পাকিয়ে ওরকম দেখতে হয়ে যায়।

কাকাবাবু বললেন, হাড় নেই বটে, ওটা দিয়ে গুঁতোনো যায় না তাও ঠিক, কিন্তু ওই লোমের মতন জিনিসটাই খানিকটা শক্ত হয়ে যায়, নাকের ওপর থেকে কেটে নেওয়া যায়।

বড়ঠাকুর বললেন, ওই শিং বা খাঁড়ারই এক-একটার দাম সাত থেকে দশ লাখ টাকা। হাতির দাঁতের চেয়েও বেশি দাম!

জোজো জিজ্ঞেস করল, কেন, কেন? অত দাম কেন? হাতির দাঁত দিয়ে অনেক কিছু বানানো যায়, গণ্ডারের শিং দিয়ে কী হয়? কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, কিছুই হয় না! জোজো বলল, কিছুই হয় না, তবু অত দাম? কারা কেনে?

কাকাবাবু বললেন, বোকা লোকেরা কেনে! অবশ্য সেই বোকা লোকদের অনেক টাকা থাকা চাই! যারা হঠাৎ বড়লোক হয়, তাদের মধ্যে এ রকম বেশ কিছু বোকা লোক থাকে। এই বোকা বড়লোকগুলো যখন বুড়ো হয়, তখন খুব ভয় পেয়ে যায়। তারা ভাবে, এত টাকাপয়সা, এত লোকজন, এসব ছেড়ে হঠাৎ একদিন মরে যেতে হবে? তখন তারা বয়স আটকাবার, গায়ের জোর বাড়াবার নানারকম ওষুধ খোঁজে। কেউ একজন এক সময় রটিয়ে দিয়েছিল যে, গণ্ডারের শিং গুঁড়ো করে, বেটে দুধের সঙ্গে খেলে যৌবন ফিরে পাওয়া যায়। যে খাবে, সে আর বুড়ো হবে না! সেই থেকে গণ্ডার মেরে-মেরে তাদের শিংগুলো গোপনে বিক্রি হয়!

সন্তু বলল, আসলে নিশ্চয়ই গণ্ডারের শিং খেলে কোনও কাজ হয় না?

কাকাবাবু বললেন, সব মানুষই একসময় বুড়ো হয়, তা আটকাবার কোনও ওষুধ এ-পর্যন্ত আবিষ্কার করা যায়নি। গণ্ডারের শিং বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে, তাতে ও রকম কোনও গুণই নেই।

সন্তু বলল, তা হলে শুধু-শুধু ওই জিনিসটা কারা কেনে অত টাকা দিয়ে?

কাকাবাবু বললেন, পৃথিবীতে কারা এখন হঠাৎ বড়লোক? আরব দেশের মরুভূমিতে পেট্রোল আবিষ্কারের পর সেখানকার অনেক লোক দারুণ ধনী হয়ে গেছে। এককালে যারা ছিল বেদুইন, তারা এখন কোটি-কোটি টাকার মালিক। অত টাকা নিয়ে কী করবে, ভেবেই পায় না! আজেবাজে ভাবে খরচ করে। দশ লাখ টাকা দিয়ে একটা গণ্ডারের শিং কেনা তাদের পক্ষে কিছুই না।

জোজো জিজ্ঞেস করল, দুধের সঙ্গে গণ্ডারের শিং বাটা, কেমন খেতে লাগে?

কাকাবাবু বললেন, আমি তো খেয়ে দেখিনি! কেউ দিলেও আমি খাব না! তবে, একবার প্লেনে কায়রো যাওয়ার সময় একজন আরব শেখের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কথায় কথায় সে বলল, ইন্ডিয়ার গণ্ডারের শিং খুব ভাল জিনিস, একখানা খাওয়ার পরেই সে বুড়ো বয়েসে আর-একটা বিয়ে করেছে! সে বলেছিল, জিনিসটা ওরকম বিচ্ছিরি দেখতে বটে, কিন্তু বেটে দুধের সঙ্গে মেশালে বেশ স্বাদ হয়। ঝাঁঝালো স্বাদ, অনেকটা আদার মতন।

বড়ঠাকুর বললেন, দিল্লির গোয়েন্দা বিভাগ খবর পেয়েছে, এ-মাসে বোম্বাইতে চারজন আরব ব্যবসায়ী এসে পৌঁছেছে, তারা অন্তত একশোটা গণ্ডারের শিং কিনবে। সুতরাং এখন চোরাশিকারিরা প্রচুর গণ্ডার মারবে।

জোজো বলল, গোয়েন্দারা যখন টের পেয়েই গেছে, তখন ওই আরব ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার করছে না কেন?

বড়ঠাকুর বললেন, আগে থেকে কি গ্রেফতার করা যায়? বেআইনি জিনিস তাদের কাছে পাওয়া গেলে তবে তো ধরা হবে? তার আগে নিরীহ গণ্ডারগুলো শুধু-শুধু মারা পড়বে।

কাকাবাবু বললেন, এই তেজপুরের দিকটাতেই গণ্ডারের শিঙের চোরাকারবারের বড় বাজার। এখান থেকেই গণ্ডারের শিং বোম্বাইয়ের দিকে যায়। সেইজন্যই আমাকে তেজপুরে পাঠানো হয়েছে। কেউ যাতে কিছু বুঝতে না পারে, সেইজন্য আমি বেড়াবার ছুতো করে এসেছি।

বড়ঠাকুর বললেন, আপনি কি কিছু পরিকল্পনা করেছেন? সেইমতো আমাদের সব ব্যবস্থা নিতে হবে। দেরি করলে চলবে না। পাঁচ-ছ বছর আগে এখানে দারুণ বন্যা হয়েছিল, তখন প্রায় আশি-নব্বইটা গণ্ডার মারা যায়। এবারেও যদি শখানেক গণ্ডার ধ্বংস হয়, তা হলে ওদের সংখ্যা খুবই কমে যাবে।

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, পরিকল্পনা একটা করেছি বটে!

জোজো বাধা দিয়ে বলল, কাকাবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব? কিছু মনে করবেন না?

কাকাবাবু বললেন, না, না, বলে ফেলো, বলে ফেলো। পেটের মধ্যে কথা আটকে রাখতে নেই!

জোজো বলল, চোরাশিকারিরা গণ্ডার মারে। পুলিশ কিংবা মিলিটারি দিয়েই তো তাদের ধরা উচিত। দিল্লি থেকে আপনাকে পাঠাল কেন? আপনি, মানে, আপনি জঙ্গলের মধ্যে দৌড়তে পারবেন না, তাড়াতাড়ি গাছে চাপতে পারবেন না, অনেকে মিলে আক্রমণ করলে আপনি একাই বা কী করবেন?

কাকাবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, তা ঠিক, তা ঠিক। আমি খোঁড়া লোক, আমার অনেক অসুবিধে। দিল্লির কর্তারা আমার ওপর বেশি-বেশি বিশ্বাস করে। হয়তো আমি কিছুই পারব না।

বড়ঠাকুর এবার কাকাবাবুকে মিস্টার রায়চৌধুরী না বলে কাকাবাবু বলেই সম্বোধন করে বললেন, আমি বলছি কারণটা। শোনো জোজো, পুলিশ কিংবা মিলিটারি দিয়েও এই চোরাশিকারিদের দমন করা যায় না। এত বড় জঙ্গল, রাতের অন্ধকারে কোথায় ওরা লুকিয়ে থাকে, কখন চট করে একটা গণ্ডার মেরে পালায়, তা ধরা শক্ত। তা ছাড়া, পুলিশ বা বনবিভাগ থেকে অভিযান চালাবার আগেই কী করে যেন ওরা খবর পেয়ে যায়।

কাকাবাবু বললেন, পুলিশ আর বনবিভাগে যে ওদের নিজস্ব লোক থাকে, সেটা স্বীকার করুন না। অনেক টাকার কারবার, তাই ওরা টাকা দিয়ে অনেককে হাত করে রাখে। সেইজন্যই ওদের ধরা যায় না।

বড়ঠাকুর বললেন, কে যে ওদের খবর দেয়, তাও বোঝা যায় না। সুতরাং ওদের দমন করতে হবে বুদ্ধি দিয়ে। কাকাবাবু একবার আফ্রিকার কেনিয়াতে একটা বিরাট বন্যজন্তু-চোরাশিকারির দলকে শায়েস্তা করেছিলেন, দিল্লির গগায়েন্দারা সে-খবর জানে। সেইজন্যই তারা কাকাবাবুর ওপর ভরসা করেছে।

কাকাবাবু বললেন, সেবারে কেনিয়ায় ওই ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিলুম পাকেচক্রে। সন্তু, তোর মনে আছে?

সন্তু বলল, হ্যাঁ, সেবারে আমরা সেরিংগেটি ফরেস্টের মধ্যে একটা তাঁবুর হোটেলে ছিলাম।

কাকাবাবু বললেন, এবারেও যে আমি কিছু করতে পারব, তার ঠিক নেই। তবু চেষ্টা তো করতে হবে। আচ্ছা, হিম্মত রাও লোকটা কীরকম? ওর সঙ্গে চোরাশিকারিদের যোগ আছে?

বড়ঠাকুর বললেন, থাকতেও পারে। ওর অনেক টাকা, অনেক লোকবল। কিন্তু ওকে ধরা-ছোঁয়া যায় না। একবার ওর বাড়ি সার্চ করেও কিছু পাওয়া যায়নি।

কাকাবাবু বললেন, অতখানি ছড়ানো বাড়ি, দেখেই বুঝেছি, ওখান থেকে কিছু খুঁজে বের করা শক্ত। ওর ওপর নজর রাখতে হবে। আর ওই কুমার টিকেন্দ্রজিৎ, সে আসলে কী করে?

বড়ঠাকুর বললেন, টিকেন্দ্রজিৎকে দেখেছেন? রহস্যময় মানুষ। ও যে কী। করে, তা বলা শক্ত। ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। কখনও এখানে, কখনও মণিপুরে, কখনও অরুণাচলে চলে

যায়। আপনি তো জানেন, তিনটে আলাদা রাজ্য, পুলিশ আলাদা, বনবিভাগ আলাদা। ওর পেছনে তাড়া করলেই ও অন্য রাজ্যে ঢুকে যায়, আমরা সেখানে যেতে পারি না। মণিপুরে ওর একটা বাড়ি আছে, সেখানকার পুলিশ জানিয়েছে যে, টিকেন্দ্রজিতের নামে কোনও অভিযোগ নেই। একবার টিকেন্দ্রজিৎ এখানে হরিণ মারতে গিয়ে ধরা পড়েছিল, আদালতে জরিমানা দিয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা, ও অন্য বড় জানোয়ারও মারে। শুনেছি, ওর হাতের টিপ সাঙ্ঘাতিক।

কাকাবাবু বললেন, লোকটি ইন্টারেস্টিং। বারবার দেখা দিচ্ছে কিন্তু আলাপ করছে না। ওর সঙ্গে একবার কথা বলার ইচ্ছে আছে। এবার আমার পরিকল্পনাটা শুনবেন?

বড়ঠাকুর ব্যগ্রভাবে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন, বলুন।

কাকাবাবু বললেন, কাল থেকে আগামী সাতদিন আপনারা পুলিশের সাহায্য নিন। আপনাদের ফরেস্ট গার্ড ও পুলিশ মিলে সমস্ত জঙ্গলটা চষে ফেলুক, রাত্তিরবেলাও টহল দিক। টানা সাত দিন, ব্যস, তারপর আর কিছু দরকার নেই।

বড়ঠাকুর হতাশভাবে বললেন, ব্যস, শুধু এই? এতে কিছু কাজ হবে মনে করেন?

তিনি রাজ সিংয়ের দিকে তাকালেন। রাজ সিং এতক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। এবার দৃঢ়ভাবে বললেন, আমার মনে হয়, এতে কিছুই কাজ হবে না। একজনও চোরাশিকারি ধরা পড়বে না।

কাকাবাবু একগাল হেসে বললেন, আমিও তো জানি, এতে কিছু কাজ হবে। এটা ওদের চোখে ধূলো দেওয়া। এই সাত দিন শিকার তো অন্তত বন্ধ থাকবে! চোরাশিকারিরা জানে, পুলিশ-ফরেস্ট গার্ডরা যদি একটানা সাতদিন ধরে এত উৎসাহ নিয়ে বন পাহারা দেয়, তা হলে সাতদিন পরে তাদের উৎসাহ হঠাৎ আবার থেমে যাবে। তখন জঙ্গল একেবারে নিরিবিলি। তখন চোরাশিকারিরা কাজে নেমে পড়বে, সেই অবস্থায় তাদের ধরতে হবে।

রাজ সিং বললেন, কে ধরবে?

কাকাবাবু বললেন, আমরা কয়েকজন যাব শুধু।

বড়ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, কী করে বোঝা যাবে, তারা কোথায় অপারেট করছে?

কাকাবাবু বললেন, বোঝার উপায় আছে। এই সাতদিনের মধ্যে আপনাদের আর-একটা কাজও করতে হবে। এই দেখুন!

কোটের পকেট থেকে কাকাবাবু ফস করে একটা ম্যাপ বার করলেন। সেটা কোলের ওপর বিছিয়ে ধরে বললেন, কাজিরাঙা ফরেস্টের এই ম্যাপটা দেখে-দেখে আমার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। কোর এরিয়ার মধ্যে, যেখানে গণ্ডারের সংখ্যা বেশি, সেখানে মোট পাঁচটি জলাশয় বা ঝিল আছে। একটা খুব বড় ঝিল, আর চারটি ছোট। এই যে সাতদিন আপনারা জঙ্গলে পাহারা দেবেন, তার মধ্যে গোপনে আর-একটা কাজ করতে হবে। এই চারটে ছোট ঝিল থেকে পাম্প করে সব জল তুলে নিতে হবে। একেবারে শুকনো করে ফেলবেন, কাদা কাদা অবস্থাটা গণ্ডাররা ভালবাসে। সেইজন্য একেবারে শুকনো খটখটে করে ফেলা চাই। তা হলে একটা ঝিলে শুধু জল থাকবে, জন্তু-জানোয়ারেরা সেখানেই যাবে, চোরাশিকারিরাও সেখানে গিয়ে জমায়েত হবে। তখন শুরু হবে আমাদের কাজ।

বড়ঠাকুর বললেন, তবু যেন এর মধ্যে একটা আন্দাজের ব্যাপার থেকে যাচ্ছে। চোরাশিকারিরা ঠিক কবে, কখন জমায়েত হবে, তা আমরা জানব কী করে?

কাকাবাবু বললেন, খানিকটা আন্দাজের ব্যাপার তো থাকবেই। এ তো অঙ্ক নয়। তবে, আন্দাজটাও যুক্তিহীন নয়। গণ্ডার শিকার কখন হয় নিশ্চয়ই জানেন। জ্যোৎস্না রাতে। কেন জানেন? আপনারা হয়তো জানেন, সন্তুদের বুঝিয়ে দিচ্ছি। গণ্ডার শিকার করা তত সহজ ব্যাপার নয়। অত শক্ত, পুরু চামড়া একেবারে লোহার বর্মের মতন, এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে গণ্ডার মারা যায় না। আহত গণ্ডার অতি সাঙ্ঘাতিক প্রাণী, সারা বন একেবারে তছনছ করে দেবে। সেইজন্য ভাল করে দেখেশুনে টিপ করে গুলি চালাতে হয়। অন্ধকার

রাতে তা সম্ভব নয়। গণ্ডারের শরীরের দুটি মাত্র জায়গা নরম। এক, তার খাঁড়ার ঠিক নীচে, নাকের কাছটায়। আর পেছন দিকে যখন ল্যাজ তোলে, সেখানে গুলি চালালে সঙ্গে-সঙ্গে গণ্ডার মরে যায়। সামনাসামনি এসে নাকের কাছে গুলি চালাবার সাহস কজনের আছে? তাই চোরাশিকারিরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে, কখন গণ্ডার একবার লেজটা তুলবে।

বড়ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ, জোৎস্না রাতের ব্যাপারটা ঠিকই বলেছেন।

কাকাবাবু বললেন, আর ঠিক নদিন পরেই পূর্ণিমা। সাত দিনের মধ্যে বনের মধ্যে পুলিশ আর গার্ডদের তাণ্ডব চলার পর থেমে গেলে, তারপর ওই জ্যোৎস্না রাতে চোরাশিকারিরা কাজে নেমে পড়বে, এরকম ধরে নেওয়া যায় না? এক দিন নাহয়, দু দিন, তিন দিন আমাদের সেখানে গিয়ে বসে থাকতে হবে। মাচা বেঁধে রাখতে হবে গাছের ওপর।

বড়ঠাকুর বললেন, ঠিক আছে। আপনার কথামতন সব ব্যবস্থা হবে। আমি আর রাজ সিং রোজ সন্ধেবেলা এসে আপনাকে রিপোর্ট দিয়ে যাব।

কাকাবাবু বললেন, না, না, না, না, আমার সঙ্গে এর মধ্যে আর দেখাই হবে। বেড়াতে এসে কেউ তেজপুরের মতন শহরে সাতদিন বসে থাকে? তা হলেই লোকে সন্দেহ করবে। আমরা তিনজন কাল বিকেলেই এখান থেকে চলে যাব শিলচর। অন্য জায়গায় বেড়াব। ফোনে যোগাযোগ রাখব আপনার সঙ্গে। আর পূর্ণিমার দিন দিনের বেলাই চলে যাব সরাসরি জঙ্গলে।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর উঠে পড়লেন বড়ঠাকুর আর রাজ সিং। কাকাবাবুদের খাবারের দেরি হয়ে গেছে অনেক। মণ্টা সিং খবর নিয়ে গেছে দু বার।

ওঁদের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে কাকাবাবু বললেন, দেখবেন, সব ব্যাপারটা যেন গোপন থাকে। আপনি নিজে জঙ্গলে গিয়ে রাত জাগতে রাজি আছেন তো?

বড়ঠাকুর বললেন, নিশ্চয়ই। রাজ সিংও থাকবেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তপন রায় বর্মণ আর শচীন সইকিয়া, এদের বিশ্বাস করা যায়?

বড়ঠাকুর বললেন, এরা খুবই বিশ্বাসযোগ্য অফিসার। শচীন রাইফেল শুটিং খুব ভাল জানে। তপনও খুব কাজের লোক।

কাকাবাবু বললেন, ঠিক আছে। আর কাউকে কিছু জানাবার দরকার নেই। আপনারা এই চার জন আমার সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট। মোট পাঁচ জন।

সন্তু বলল, বাঃ, আমরা থাকব না? আমি আর জোজো? আমরা তো থাকবই।

জোজো বলল, তা হলে হল সাত জন। সপ্তরথী, কী বল সন্তু?

বড়ঠাকুর ওদের দু জনের কাঁধ চাপড়ে দিলেন।

সন্তুর মুখোনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কাকাবাবু আগে তাকেও কিছু বলেননি। শুধু এমনি বেড়ানোও ভাল, বেশ ভালই লেগেছে এই ক দিন। তবে এখন বেড়ানোর সঙ্গে একটা অ্যাডভেঞ্চার যুক্ত হল বলে তার আরও ভাল লাগছে।

৬. রাত্তিরবেলা ঘরে যে-কোনও শব্দ

রাত্তিরবেলা ঘরে যে- কোনও শব্দ হলেই কাকাবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমে তিনি বুঝতে পারলেন না শব্দটা কীসের।

তারপর আবার সামান্য ক্যাঁচ করে শব্দ হল। দরজাটা খুলে যাচ্ছে। চাবি দিয়ে কেউ দরজাটা খুলেছে।

বালিশের নীচে রিভলভার রাখা কাকাবাবুর বরাবরের অভ্যেস। সেটা বার করে কাকাবাবু উঠে বসলেন।

ঘর অন্ধকার, তবু বোঝা গেল একটি ছায়ামূর্তি পা টিপেটিপে ঢুকছে ঘরে।

সে মাঝখানে আসবার পর কাকাবাবু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, মাথার ওপর হাতদুটো তুলে দাঁড়াও। একটু নড়বার চেষ্টা করলেই আমি গুলি করব।

খুট করে তিনি বিছানার পাশে একটা আলো জ্বাললেন। এবং অবাক হয়ে দেখলেন, কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে আছে মণ্টা সিং।

সে হাতজোড় করে বলল, আপনি জেগে আছেন! আমায় মাপ করবেন স্যার, আপনার ঘুম ভাঙাতে চাইনি। খুব দরকারে পড়ে আসতে হল একটা জিনিস নিতে। আমার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি থাকে, কিন্তু এবাংলো থেকে কারও কোনও জিনিস হারায় না। আমি ভেবেছিলাম স্যার, আপনার ঘুম না ভাঙিয়ে জিনিসটা নিয়ে যাব।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কী জিনিস?

মণ্টা সিং বললেন, বালিশ। আপনার মাথার কাছে আলমারিতে স্যার একস্ট্রা বালিশ রাখা আছে। হঠাৎ দরকার পড়ল।

কাকাবাবু বললেন, এত রাতে হঠাৎ একস্ট্রা বলিশের দরকার পড়ল কেন?

মণ্টা সিং বলল, দু জন গেস্ট এসে একখানা ঘর চাইছে স্যার। পুলিশের দু জন অফিস্যার। তাদের তো থাকতে দিতেই হয়। ও-ঘরে একটা বালিশ কম আছে, একটা কম্বলও লাগবে, তাই ভাবলাম আপনাকে না বিরক্ত করে কীভাবে নিয়ে যাই–

কাকাবাবু দিনের বেলা ওই আলমারিটা খুলে দেখেছিলেন, সত্যি ওটার মধ্যে অনেক বালিশ আর কম্বল রাখা আছে। মন্টা সিংয়ের কথাটা মিথ্যে নয়। রিভলভারটা নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, ঠিক আছে, নিয়ে যাও!

মন্টা সিং কাকাবাবুর খাটের পিছনে এসে আলমারি খুলে বালিশ বার করতে লাগল।

তারপর হঠাৎ সে ঘুরে গিয়ে, কাকাবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটা রুমাল চেপে ধরল তাঁর নাকে।

মণ্টা সিং বেশ বলশালী লোক। কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে পারবে কেন? কাকাবাবু একটু পরেই এক ঝটকা দিয়ে তাকে ফেলে দিলেন মাটিতে।

তাকে ধমকে বললেন, স্টুপিড, এত রাতে গুণ্ডামি করতে এসেছ? তোমার চাকরি থাকবে?

মণ্টা সিং আবার লাফিয়ে এসে কাকাবাবুর মাথাটা চেপে ধরার চেষ্টা করল। কাকাবাবু ভাবলেন, এবার লোকটিকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তিনি লোহার মতন দুহাতে মণ্টা সিংয়ের গলা টিপে ধরলেন।

ঠিক তখনই ঘরের মধ্যে আরও দুটো লোক ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাকাবাবুর ওপর। তারা কী একটা ভিজে-ভিজে ন্যাকড়া তাঁর নাকে ঠেসে দেওয়ার চেষ্টা করল।

কাকাবাবু এই তিনজনের সঙ্গে লড়তে গিয়েও টের পেলেন তাঁর হাতের জোর কমে আসছে, ঝিমঝিম করছে মাথা। পাশের ঘরেই সন্তু আর জোজো ঘুমোচ্ছে, ওদের জানানো দরকার।

তিনি ডাকতে গেলেন, গলা দিয়ে স্বর বেরোল না, চোখ অন্ধকার! এলিয়ে পড়লেন জ্ঞান হারিয়ে।

কাকাবাবুর যখন জ্ঞান ফিরে এল, তখন প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। চোখ মেলার আগেই তিনি শুনতে পেলেন কিচির মিচির পাখির ডাক। প্রথমে তাঁর মনে হল, ডাকবাংলোর ঘরেই শুয়ে আছেন, সেখানেও বাগানে অনেক পাখি ডাকে, ভোরবেলা সেই ডাক শুনে তাঁর ঘুম ভাঙে।

চোখ মেলে কাকাবাবু দেখলেন, তাঁর মাথার ওপর মস্ত বড় একটা গাছ, তার ডালপালার ফাঁক দিয়ে একটু-একটু ভোরের আকাশ দেখা যাচ্ছে।

তারপর মাথাটা একটু উঁচু করে দেখলেন, একটু দূরে বসে আছে তিনটি লোক, মাঝখানে আগুন জ্বলছে, পিছন দিকে ঘন জঙ্গলে এখনও আলো ফোটেনি।

তখন তাঁর একটু-একটু করে সব মনে পড়ল। মাঝরাতে মণ্টা সিং ঢুকেছিল ঘরে, বিশ্বাসঘাতক মন্টা সিং! বাংলোর কেয়ারটেকার হয়েও সে আচমকা তাঁকে আক্রমণ করেছিল, তারপর পিছন থেকে আরও কয়েকজন...। নাকে ক্লোরোফর্ম ঠেসে তাঁকে অজ্ঞান করে ফেলেছিল, তারপর এই জঙ্গলে নিয়ে এসেছে...।

কাকাবাবু মাথায় হাত বুলিয়ে দেখলেন, কোথাও চোট লেগেছে কি না। না, রক্তক্ত কিছু নেই, সারা গায়ে ব্যথাও নেই। রিভলভারটা রয়ে গেছে বালিশের নীচে, নাকি এরা চুরি করে নিয়েছে?

তিনি দেখলেন, লম্বা কোটটা তাঁর গায়েই রয়েছে। এটা পরে তো তিনি ঘুমোত যাননি, খুলে রেখেছিলেন। খুব শীত বলে এরা কোটটা তার গায়ে পরিয়ে এনেছে। কোটের পকেটে হাত দিয়ে তিনি তাঁর চশমাটা পেয়ে গেলেন।

এবারে তিনি দেখলেন, সেই লোক তিনটি কাপে করে চা খাচ্ছে।

প্রথমেই তাঁর মনে হল, এরা এই জঙ্গলে চায়ের কাপ আর চা-দুধ-চিনি কোথায় পেল? সব সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, না এখানেই কোথাও এসব লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা আছে? কাছাকাছি কুঁড়ে ঘরটরও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

ওদের একজন বলল, জ্ঞান ফিরেছে দেখছি, চা খাবে?

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, আমার ক্রাচ দুটো কোথায়?

অন্য একজন বলল, তা আমরা কী জানি! কেন, ক্রাচ দিয়ে কী হবে?

কাকাবাবু বললেন, ক্রাচ না হলে হাঁটতে পারি না। আমি এখন ডাকবাংলোয় ফিরে যাব। দাঁত না মেজে আমি খাই না কিছু।

লোক তিনটি হাসতে লাগল।

এবার কাকাবাবু ওদের মধ্যে একজনকে চিনতে পারলেন। জলিল শেখ, সেই পাখি-চোর, যার সব পাখি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অন্য দু জনের চেহারা দুগাঠাকুরের অসুরের মতন।

কাকাবাবু বললেন, জলিল শেখ, তোমায় থানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি বাঁচিয়ে দিলাম। তারপরেও তুমি এইসব অপকর্ম শুরু করেছ?

জলিল বেশ জোরে থুঃ শব্দ করে মাটিতে থুথু ফেলল। তারপর বলল, তুমি আমার ভাত মারতে চেয়েছিলে। আমার রোজগার বন্ধ করে দিতে চেয়েছিলে। তখনই আমি মনে-মনে বলেছিলাম, তোমাকে আবার বাগে পেলে দেখে নেব।

কাকাবাবু বললেন, কেন, দেখলাম তো তোমার বেশ ভাল বাড়ি। পুকুর আছে, বাগান আছে, তুমি চাষবাস করলেই পারো! তোমার মেয়ে ফিরোজা কেমন আছে?

অন্য একজন বলল, এই জলিল, কথা বলিস না, কথা বলিস না। হুকুম নেই।

এই সময় জঙ্গলের মধ্যে কীসের যেন শব্দ শোনা গেল। গাছপালা ভেদ করে কেউ আসছে, খুব জোরে।

জলিলরা একসঙ্গে ফিরে তাকাল। একজন হাতে তুলে নিল বন্দুক।

তারপরই শোনা গেল ঘোড়ার পায়ের শব্দ। দেখা গেল একটা কালো রঙের ঘোড়া ছুটে আসছে, তার ওপর কালো পোশাক পরা একজন সওয়ার।

একেবারে কাছে এসে ঘোড়ার রাশ টেনে থামাল টিকেন্দ্রজিৎ। তারপর সাকাসের খেলোয়াড়ের মতন লাফিয়ে নেমে পড়ল। তার কোমরে একটা চওড়া বেল্ট, এক পাশে রিভলভারের খাপ। হাতে চাবুক।

সে কাকাবাবুর সামনে এসে পা ফাঁক করে, কোমরে দু হাত দিয়ে দাঁড়াল। তার পায়ে গাম বুট, মাথায় টুপি।

কাকাবাবু তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল করে তাকিয়ে দেখলেন। টিকেন্দ্রজিতের চেহারাটা সত্যি সুন্দর। প্রায় ছ ফুটের কাছাকাছি লম্বা, সারা শরীরে একটুও চর্বি নেই, সরু কোমর, চওড়া বুক, চওড়া কাঁধ। চোখ দুটো টানা-টানা, ধারালো নাক। একেবারে ইংরেজি সিনেমার নায়কের মতন। কাকাবাবুদের ছেলেবেলায় গ্যারি কুপার নামে একজন নায়ক ছিল, অনেকটা সেইরকম, যদিও টিকেন্দ্রজিতের গায়ের রং ফরসা নয়।

কাকাবাবু দু হাত জোড় করে কপালের কাছে তুলে বললেন, নমস্কার, আপনিই তো কুমার টিকেন্দ্রজিৎ? আপনার সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল।

টিকেন্দ্রজিৎ কাকাবাবুর চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কোনও কথা বলল না।

কয়েক মুহূর্ত পরে জলিলদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, একে চা দিয়েছিস?

একজন বলল, জিজ্ঞেস করেছিলাম, দাঁত না মেজে চা খায় না বলল।

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, একটা নিমডাল ভেঙে দে। দাঁতন করে নিক।

নিজে সে এক কাপ চা নিয়ে আস্তে-আস্তে হেঁটে চলে গেল জঙ্গলের দিকে।

জলিল কাকাবাবুকে একটা নিমগাছের ডাল আর এক মগ জল এনে দিল। কাকাবাবু আর আপত্তি না জানিয়ে মুখ ধুয়ে নিলেন। ভোরবেলা তাঁর চা খাওয়ার অভ্যেস।

কাকাবাবুর চা খাওয়া শেষ হতেই ফিরে এল টিকেন্দ্রজিৎ। লোক তিনটিকে বলল, এবার ওকে ওই শিমুলগাছটার সঙ্গে বাঁধ ভাল করে। নায়লনের দড়ি এনেছিস তো?

লোক তিনটি কাকাবাবুর দিকে এগিয়ে আসতেই তিনি টিকেন্দ্রজিতকে বললেন, আমাকে বাঁধবার দরকার কী? এমনিই তো আমরা কথা বলতে পারি। খোঁড়া পা নিয়ে আমি তো দৌড়ে পালাতে পারব না!

টিকেন্দ্রজিৎ কাকাবাবুর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে বলল, তুমি পালাতে পারবে না জানি। পালাবার কোনও উপায় তোমার নেই। তবে, তুমি যদি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করো, তা হলে প্রথমেই ছুরি দিয়ে তোমার একটা কান কেটে নেওয়া হবে। এ পর্যন্ত তোমাকে কোনও আঘাত করা হয়নি।

ওরা এসে কাকাবাবুর দু হাত ধরে টানতে লাগল। কাকাবাবু বুঝলেন, বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে সত্যিই কোনও লাভ নেই।

ওরা একটা গাছের কাছে নিয়ে এসে কাকাবাবুর হাত দুটো পিছনে মুড়িয়ে বাঁধল, তারপর পা দুটোও বেঁধে দিল। কাকাবাবুর আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা এই না।

টিকেন্দ্রজিৎ এবার গাছটা ঘুরে-ঘুরে কাকাবাবুর হাত ও পায়ের বাঁধন পরীক্ষা করে দেখল। সন্তুষ্ট হওয়ার পর সে তার প্যান্টের পকেট থেকে এক প্যাকেট বিস্কুট বার করে ঢুকিয়ে দিল কাকাবাবুর কোটের পকেটে। কাকাবাবু এর মানে বুঝতে পারলেন না। চা খাওয়ার সময় বিস্কুট দিল না, এখন বিস্কুট দিয়ে কী হবে? হাত বাঁধা, ইচ্ছে করলেও তো বিস্কুট খেতে পারবেন না।

টিকেন্দ্রজিৎ মুখের সামনে এসে বলল, সেদিন আমি নিজে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলাম। আপনি আলাপ করেননি, আমাকে একবার বসতেও বলেননি। সেইজন্যই এই ব্যবস্থা।

কাকাবাবু আকাশ থেকে পড়ে বললেন, সে কী! আপনি ঝড়ের বেগে ঘোড়ায় চড়ে এলেন। হিম্মত রাওয়ের বাড়ি চায়ের নেমন্তন্নের কথা বললেন। আপনি কে, আপনার নাম কী, কোনও পরিচয়ই দেননি!

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, কুমার টিকেন্দ্রজিৎ কখনও নিজে থেকে পরিচয় দেয় না। তাকে চিনে নিতে হয়।

কাকাবাবু বললেন, আমি নতুন এসেছি, কী করে আপনাকে চিনব?

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, কিন্তু আমাকে দেখে কি সাধারণ চাকরবাকর মনে হয়? আমাকে একবার বসতেও বলেননি!

কাকাবাবু বললেন, আপনি এমন ছটফট করছিলেন, শুধু চায়ের নেমন্তন্নের কথা, যাই হোক, আমাদের ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে অবশ্যই বসতে বলা উচিত ছিল।

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, এখন আর ওসব বললে কী হবে? শুনুন, মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনাকে আমি ছেড়ে দেব। কেউ কিছু জানবার আগেই আপনাকে সসম্মানে বাংলোতে পৌঁছে দেব। সবাই ভাববে, আপনি মর্নিং ওয়াক করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আজ দুপুরের মধ্যেই ছেলে দুটিকে নিয়ে আপনাকে কলকাতায় ফিরে যেতে হবে। তিনটের সময় ফ্লাইট আছে।

কাকাবাবু বললেন, হঠাৎ ফিরে যাব কেন? আমরা বেড়াতে এসেছি।

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, আপনি বেড়াতে আসেননি। আপনি কে, কীজন্য এসেছেন, তা আমরা সব জানি। বড়ঠাকুর আর রাজ সিংয়ের সঙ্গে আপনি। গোপন শলা-পরামর্শ করেছেন। ওরা যতই বাধা দেওয়ার চেষ্টা করুক, গণ্ডার আমরা মারবই! বিদেশ থেকে ব্যবসাদাররা এসেছে, আপনারাও জানেন, আমরাও জানি, প্রায় দশ কোটি টাকার কারবার, এই সুযোগ কেন ছাড়ব? আপনি আজই ফিরে যেতে রাজি আছেন?

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, কুমার টিকেন্দ্রজিৎ, আপনি যদি আমাকে চিনে থাকেন, তা হলে এটাও আপনার জানা উচিত যে, কারও হুকুমে আমি ভয় পেয়ে পালাই না।

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা সবাই করে। প্রাণ বাঁচাবার জন্য লোকে আত্মীয়স্বজন ত্যাগ করে, দেশ ছেড়ে চলে যায়, কত কী করে! দশ কোটি টাকার কারবার, এবারে আমরা দু-চারটে মানুষ মারতেও দ্বিধা করব না। জেনে রাখবেন, কুমার টিকেন্দ্রজিৎকে বাধা দেওয়ার সাধ্য কারও নেই। হ্যাঁ, আপনি হঠাৎ ফিরে গেলে বড়ঠাকুররা কী ভাববে, তাই তো? ডাকবাংলোয় ফিরে গিয়েই আপনি শুয়ে পড়বেন। যন্ত্রণায় ছটফট করার ভাব দেখাবেন। সবাইকে বললেন, আপনার বুকে খুব ব্যথা হচ্ছে। হার্ট অ্যাটাক। আপনার চিকিৎসার জন্যই তো ফিরে যাওয়ার দরকার। হার্ট অ্যাটাক নিয়ে

তো আর আপনি জঙ্গলে পাহারা দিতে পারবেন না! আপনি পশ্চিমবাংলার লোক, অসমের জঙ্গলে গণ্ডার মারা হচ্ছে কি না হচ্ছে, তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাবার কী দরকার?

কাকাবাবু মৃদু হেসে বললেন, এখন অধিকাংশ জঙ্গলকেই বলে ন্যাশনাল ফরেস্ট। সংরক্ষিত জাতীয় অরণ্য। এর মধ্যে অসম, বাংলা, বিহারের তো কোনও ব্যাপার নেই। এই অরণ্যের প্রাণীরা আমাদের জাতীয় সম্পদ। এদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা আমাদের সবারই করা উচিত।

টিকেন্দ্রজিৎ বিদ্রুপের সুরে বলল, গণ্ডার একটা বিশ্রী প্রাণী। কুৎসিত দেখতে। সব সময় কাদায় গড়াগড়ি যায়। ওদের বাঁচিয়ে রাখার কী এমন দায় পড়েছে? গণ্ডার মেরে যদি এত টাকা পাওয়া যায়, তা হলে মারব না কেন?

কাকাবাবু বললেন, এই রে, এটা আপনি কী বললেন কুমার? দেখতে খারাপ বলেই মেরে ফেলতে হবে? আপনার চেহারা সুন্দর, আপনার তুলনায় আমি দেখতে খারাপ, পৃথিবীতে আরও কত লোক আছে, যারা আপনার তুলনায় দেখতে খারাপ, তাদের সবাইকে আপনি মেরে ফেলবেন? আর একটা কথা কী জানেন, আপনি বলছেন, গণ্ডাররা বিশ্রী দেখতে। গণ্ডাররা হয়তো আপনাকে, আমাকেও মনে করে বিশ্রী প্রাণী। ওদের মতন আমাদের মাথায় শিং বা খাঁড়া নেই। তা বলে গণ্ডাররা তো আমাদের মেরে ফেলতে চায় না। ওরা আপনমনে জঙ্গলে থাকে। আমরাও ওদের মারব না, ওরাও আমাদের মারবে না, এই তো সবচেয়ে ভাল।

টিকেন্দ্রজিৎ একবার পেছন ফিরে নিজের লোকদের দিকে তাকাল। তারপর হঠাৎ কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে কর্কশ গলায় বলল, তর্কের শেষ! তোমাকে বাঁচার সুযোগ দিয়েছিলাম, রাজা রায়চৌধুরী, তুমি তা নিলে না!

কাকাবাবু বললেন, খুব তাড়াতাড়ি মরে যাওয়ার ইচ্ছে আমার একটুও নেই। শুধু-শুধু মরতে যাব কেন?

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, এক্ষুনি এক কোপে তোমার মুণ্ডু উড়িয়ে দিতে পারি।

কাকাবাবু বললেন, দাও না দেখি! তুমিই তো প্রথম নও, আমাকে এ রকম কথা আগেও অনেকে বলেছে। কিন্তু কেউ তো পারেনি এ-পর্যন্ত!

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, তুমি তো আগে টিকেন্দ্রজিৎকে দ্যাখোনি? আমার মায়াদয়া নেই। গণ্ডার আমি মারব। গণ্ডার শিকার আমার কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। এবার আমি মারবই, মারবই, মারবই! অন্তত একশোটা গণ্ডার মারব! তোমাকেও মারতে আমার হাত কাঁপবে না!

এবার সে জলিলদের বলল, তোরা চলে যা। তোদের আর দরকার নেই। এর ব্যবস্থা আমি করছি!

ওরা তিনজন জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি সরে পড়ল। ওদের মুখ-চোখ দেখলেই বোঝা যায় টিকেন্দ্রজিৎকে দারুণ ভয় পায়।

আগুন নিবে গেছে। আকাশ ভরা এখন সকালের আলো। প্রচুর পাখি তো ডাকছেই, একঝাঁক টিয়া উড়ে গেল সামনে দিয়ে। টিকেন্দ্রজিৎ তার ঘোড়ার সঙ্গে বাঁধা একটা থলি নিয়ে এল কাঁধে ঝুলিয়ে।

কাকাবাবু বললেন, টিকেন্দ্রজিৎ, তুমি কথা বলতে বলতে হঠাৎ আমার চুলের মুঠি চেপে ধরলে কেন? ছিঃ আমার মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা আছে। কেউ যদি আমার গায়ে হাত দেয়, তা হলে আমি তার শোধ না নিয়ে ছাড়ি না। আমাকেও একদিন তোমার চুলের মুঠি চেপে ধরতে হবে।

টিকেন্দ্রজিৎ দারুণ অবাক হয়ে ভুরু তুলে রইল।

তারপর বলল, তুমি এখনও ভাবছ, তুমি ছাড়া পাবে? এই বাঁধন তুমি খুলতে পারবে? তা ছাড়া এক্ষুনিই তো আমি তোমায় মেরে ফেলতে পারি।

কাকাবাবু বললেন, আমায় মেরে ফেললে আর-একজন আসবে। আমি এমন ব্যবস্থা করে এসেছি যে, আমায় সত্যি-সত্যি কেউ মেরে ফেললেও তার শোধ নেওয়া হবেই। তুমি কিছুতেই নিস্তার পাবে না টিকেন্দ্রজিৎ!

টিকেন্দ্রজিৎ হা-হা করে হেসে উঠে বলল, আমায় কেউ কোনও দিন ধরতে পারবে না। সে সাধ্য কারও নেই। আমি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি, তা জানো? শোনো, তোমাকে আমি নিজের হাতে মারব না। এই রকম অবস্থায় ফেলে রেখে যাব। পুলিশ তোমায় খোঁজাখুঁজি করবে নিশ্চয়ই। পুলিশে আমাদের লোক আছে। তারা এই জায়গাটা বাদ দিয়ে সারা কাজিরাঙ্গা জঙ্গল খুঁজে বেড়াবে। এখানে যদি আসেও, অন্তত তিনদিন লাগবে। এই তিনদিনে তোমার অবস্থা কী হবে বলছি।

থলে থেকে একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে আরাম করে ধোঁয়া ছেড়ে টিকেন্দ্রজিৎ বলল, খুব সম্ভবত আজ রাতের মধ্যেই তুমি ভালুকের পাল্লায় পড়বে।

কাকাবাবু ধমকের সুরে বললেন, আমার দিকে ধোঁয়া ছেড়ো না। আমি চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে পারি না।

এবার অবাক হওয়ার বদলে সাঙ্ঘাতিক চটে গেল টিকেন্দ্রজিৎ। চোখ দুটো জ্বলতে লাগল হিরের টুকরোর মতন। সে গর্জন করে বলল, কী? তুমি এখনও আমাকে ধমকাচ্ছ, তোমার এত সাহস? কুমার টিকেন্দ্রজিৎ কখনও কারও ধমক সহ্য করে না!

একমুখ ধোঁয়া সে কাকাবাবুর মুখের ওপর ছাড়ল। কাকাবাবু নাক কুঁচকে ফেললেন।

তারপর সে সেই জ্বলন্ত চুরুট চেপে ধরল কাকাবাবুর বুকে।

কাকাবাবুর বুকের রোম পুড়ে গেল, চামড়া গোল হয়ে পুড়তে লাগল।

কাকাবাবু ঠাণ্ডা গলায় বলল, টিকেন্দ্রজিৎ, ও রকম কোরো না। আমি ঠিক শোধ নেব! শোধ নেব!

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, তুমি মরে ভূত হয়ে শোধ নেবে? আমি ভূতের ভয় পাই না!

চুরুটটা সেখান থেকে তুলে সে এবার কাকাবাবুর ঘাড়ের কাছে চেপে ধরল। অসহ্য যন্ত্রণা হলেও কাকাবাবু মুখ বিকৃত করলেন না, ফিসফিস করে আবার বললেন, মানুষকে কষ্ট দেওয়ার সময় মনে থাকে না যে, নিজেকেও একদিন এ রকম কষ্ট পেতে হবে! তোমার বুকে ও ঘাড়ে ঠিক এইরকমভাবে কেউ একদিন জ্বলন্ত চুরুট চেপে ধরবে!

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, সেরকম মানুষ জন্মায়নি।

চুরুটটা ফেলে দিয়ে সে এবার একটা লম্বা চকোলেট বের করল তার ঝোলা থেকে। সেটার ওপরের রাংতা ছাড়িয়ে এক কামড় খেয়ে বাকিটা রেখে দিল কাকাবাবুর কোটের পকেটে। আরও একমুঠো লজেন্সের কাগজ ছাড়িয়ে সে রাখতে লাগল সেখানে।

তারপর একটু সরে এসে বলল, তোমাকে আমি দগ্ধে-দগ্ধে মারব রাজা রায়চৌধুরী। এগুলো কেন রাখলাম জানো? তোমার যখন খুব খিদে পাবে, তখনও তুমি জানবে, তোমার কোটের পকেটেই বিস্কুট, চকোলেট, লজেন্স রয়েছে, তবু তুমি খেতে পারবে না। তুমি খেতে পারবে না, কিন্তু পিঁপড়েরা আসবে। বড় বড় লাল পিঁপড়ে। হাজার-হাজার পিঁপড়ে ঘুরবে তোমার শরীরে। তাদের কামড়ে বিষের জ্বালা। তারপর রাত্তিরবেলা জন্তু-জানোয়াররা তোমায় ছিঁড়ে খাবে।

ঝোলা থেকে একটা গণ্ডারের শিং বের করে সে বলল, এই দ্যাখো, দুটো গণ্ডার এর মধ্যেই মেরেছি। আরও মারব, অন্তত আটানব্বইটা! সব গণ্ডার শেষ হয়ে গেলেই বা ক্ষতি কী? শিং বিক্রি করা ছাড়া এই জন্তুগুলো দিয়ে মানুষের আর কী উপকার হয়!

কাকাবাবুর খুব ইচ্ছে হল জিনিসটা একবার হাত দিয়ে ধরে দেখতে। কিন্তু উপায় তো নেই!

কাকাবাবু বললেন, তুমি একলাই সব গণ্ডার মারবে? নিজের সম্পর্কে দেখছি তোমার খুব উঁচু ধারণা! গণ্ডার শিকার করা এত সহজ? তুমি আমাকে যেটা দেখালে, সেটা আসল গণ্ডারের শিং নয়, নকল!

টিকেন্দ্রজিৎ আবার কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে সেই শিংটা কাকাবাবুর নাকের ওপর চেপে ধরে বলল, এই দ্যাখো, আসল কি না!

কাকাবাবু অনুভব করলেন, সেটা আঠা দিয়ে জট পাকানো শক্ত লোমের মতন জিনিস। বিশ্রী গন্ধ!

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, আমি একলাই সব কটাকে মারব কি মারব না, তুমি তা দেখতে আসবে না। পরের ব্যাপারে তোমার নাক গলানো এই শেষ!

কাকাবাবুর মাথাটায় একবার প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিল টিকেন্দ্রজিৎ। তারপর ঘোড়াটাতে উঠে পড়ল।

এদিকে সে মুখ ফেরাতেই কাকাবাবু বললেন, আবার দেখা হবে। টিকেন্দ্রজিৎ হা-হা শব্দে অট্টহাসি করে উঠল। সেই হাসিতে যেন কেঁপে উঠল জঙ্গলের গাছপালা। হাসতে-হাসতেই সে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। এক সময় সেই হাসি আর ঘোড়ার পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল অনেক দূরে।

৭. বুকের মাঝখানে আর ঘাড়ের কাছে

বুকের মাঝখানে আর ঘাড়ের কাছে চুরুট দিয়ে পোড়ানো দুটো জায়গায় জ্বালা করছে খুব! পেটের কাছে একটা জায়গায় চুলকোচ্ছে। কাকাবাবু ভাবলেন, এখনই কী, এর পর যখন পিঁপড়েরা আসবে, তখনই আসল যন্ত্রণা শুরু হবে। সামান্য একটা পিঁপড়েকেও মারার উপায় নেই তাঁর এখন।

কতক্ষণ এইভাবে থাকতে হবে?

তিনি সত্যি-সত্যি মরে যাবেন, তা এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। এর আগে তো আরও কত বিপদে পড়েছেন, শেষ পর্যন্ত প্রাণ দিতে হবে টিকেন্দ্রজিতের মতন একটা লোকের কাছে? এইরকমভাবে জঙ্গলে, সবার চোখের আড়ালে?

এর চেয়ে সামনাসামনি কারও সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যু বরণ করা অনেক বেশি সম্মানজনক!

যদি কোনও জন্তু-জানোয়ার এসে পড়ে তো কী হবে?

হাতির পাল এলে বোধ হয় গ্রাহ্য করবে না। হাতিরা মানুষ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। গণ্ডার এলেও বিপদ নেই। ওরকম ভয়ঙ্কর চেহারা হলেও গণ্ডাররা সাধারণত নিরীহ প্রাণী। খুব রাগিয়ে না দিলে তারা কাউকে আক্রমণ করে না। তা ছাড়া, গণ্ডাররা নিশ্চয়ই বুঝবে, কাকাবাবু তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছেন!

অসমের বাঘ সাধারণত মানুষখেকো হয় না সবাই বলে। কিন্তু কোনও বাঘ এসে যদি দেখে, একটা মানুষ বাঁধা পড়ে রয়েছে, তা হলেও কি এমন একটা সহজ খাদ্য ছেড়ে দেবে? কোনওরকম শিকার করার ঝঞ্ঝাট নেই, শুধু কামড়ে কামড়ে গা থেকে মাংস খেলেই হল!

দিনের বেলা বাঘ বেরোবার সম্ভাবনা খুবই কম। তবে ভালুক আসতে পারে। এখানকার জঙ্গলে ভালুক অনেক কমে গেলেও যেকটা আছে, খুবই হিংস্র। হয়তো এদিকে কোথাও ভালুকের আস্তানা আছে। টিকেন্দ্রজিৎ জানে। ভালুক মানুষ দেখলে তার গা আঁচড়ে নখের ধার পরীক্ষা করে।

নাঃ, কোনও জন্তু-জানোয়ারের হাতে প্রাণ দিতে হবে, এটা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না!

সন্তু ঠিক আসবে। প্রথমে ওরা ভাববে, কাকাবাবু মর্নিং ওয়াক করতে গেছেন। তারপর বেলা বাড়লে নিশ্চয়ই চিন্তিত হয়ে পড়বে দু জনে। বড়ঠাকুরকে খবর দেবে। বড়ঠাকুর মানুষটি ভাল, বেশ নির্ভরযোগ্য, উনি নিশ্চয়ই চতুর্দিকে খবর পাঠাবেন।

ওঃ হো, সকালে উঠেই তো ওরা দেখতে পাবে ক্রাচ দুটো পড়ে আছে। খাটের পাশে রয়েছে জুতো। তা হলেই বুঝতে পারবে, কাকাবাবু মর্নিং ওয়াকে যাননি, কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। তা হলে সকাল থেকেই শুরু হবে খোঁজাখুঁজি। এটা একটা আশার কথা!

এখন কটা বাজে?

কাকাবাবুর হাতে ঘড়ি নেই। ঘড়ি থাকলেও দেখা যেত না, হাত দুটো যে পেছন দিকে মুড়িয়ে বাঁধা। এর মধ্যেই কাঁধ টনটন করছে। কী জ্বালাতন, কতক্ষণ থাকতে হবে এভাবে?

টিকেন্দ্রজিৎ নিশ্চয়ই জঙ্গলের এমন জায়গায় এনেছে, যেখানে কোনও টুরিস্ট আসে না। আশপাশের গ্রামের লোকও আসে না। হঠাৎ কেউ এসে পড়ে যে উদ্ধার করবে, তার সম্ভাবনা নেই। কোনও জন্তু-জানোয়ারও দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় এখন সকাল সাড়ে আটটা-নটা।

হঠাৎ হুপ-হুপ শব্দে কাকাবাবু চমকে উঠলেন। কারা আসছে? মনে হচ্ছে যেন কয়েকটা বাচ্চা ছেলে খেলা করতে করতে এগিয়ে আসছে এদিকে।

না, বাচ্চা ছেলে নয়, কয়েকটা বানর। একটার পর একটা গাছ লাফিয়ে লাফিয়ে আসছে এদিকে। গায়ের রং সোনালি, লম্বা লম্বা ল্যাজ, এইগুলোই কি গোল্ডেন লাঙ্গুর? খুব দুর্লভ জাতের বানর। ওরা কাকাবাবুকে লক্ষই করছে না। খেলা করছে নিজেদের মধ্যে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, হ্যালো, হ্যালো, লুক অ্যাট মি! আই অ্যাম হিয়ার।

বলেই তিনি লজ্জা পেলেন। অসমের জঙ্গলের বানররা ইংরেজি বুঝবে কেন? ওদের গায়ের রং অনেকটা সাহেবদের মতন, সেইজন্যই কাকাবাবুর ইংরেজি মনে এসেছে।

বানরগুলো কাকাবাবুর গলার আওয়াজ শুনে লাফিয়ে উঠল, পিছিয়ে গেল খানিকটা। তারপর সবাই সার বেঁধে বসে চোখ পিটপিট করে দেখতে লাগল। এক জন মানুষের এ রকম অবস্থা তারা কখনও দেখেনি।

কাকাবাবু বললেন, আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি তোমাদের সাহায্য চাই!

তারপরই তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, চকোলেট! চকোলেট খাবে? আমার কোটের পকেটে আছে, নিয়ে যাও না!

ইস, যদি হাত দুটো খোলা থাকত, কাকাবাবু ওদের চকোলেটের লোভ দেখিয়ে কাছে ডাকতে পারতেন!

আর কোনও জন্তু-জানোয়ার কাকাবাবুর বাঁধন খুলে দিতে পারবে না। একমাত্র বানরই ইচ্ছে করলে পারে। কারণ, ওরা হাতের ব্যবহার জানে।

ডারউইন সাহেব বলেছেন, বানররাই মানুষদের পূর্বপুরুষ। তা হলে বানরেরা কথা বলতে শেখে না কেন? ময়না, চন্দনা পাখিও মানুষের মতন কথা বলে। কুকুর কথা বলে না, কিন্তু মানুষের অনেক কথা বুঝতে পারে।

কাকাবাবু কাকুতি-মিনতি করে অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। তিনি বলতে লাগলেন, তোমাদের বাঁদর বলব না। বাংলায় বাঁদর মানে দুষ্টু ছেলে। তোমরা আসলে কপি! শাখামৃগ! কিষ্কিন্ধার অধিবাসী! রামচন্দ্র যখন সেতুবন্ধন করেছিলেন তখন তোমরা কত সাহায্য করেছিলে! লঙ্কার রাক্ষসদের কী রকম নাস্তানাবুদই না করেছিলে! তোমরা আমার বাঁধন খুলে দাও না ভাই। তোমরা যা চাও তাই খাওয়াব। অনেক চকোলেট, লজেন্স আর কলা, খুব ভাল মর্তমান কলা, আর যা খেতে চাও বলো!

ওদের মধ্যে যে পালের গোদা সে একলাফে একেবারে চলে এল কাকাবাবুর সামনে। কাকাবাবুর বুকের মধ্যে ধক করে উঠল, তা হলে ওরা তাঁর কথা বুঝতে পেরেছে? এই বানরটার চেহারা বেশ বড়, লম্বা-লম্বা আঙুল, সে ইচ্ছে। করলেই গিট খুলে দিতে পারে।

পালের গোদা বানরটা সে-চেষ্টা না করে হঠাৎ হুপ- হুপ শব্দ করে লাফাতে শুরু করল মাটিতে। খুব যেন তার আনন্দ হয়েছে। কী ব্যাপার, ও এখন নাচছে নাকি? এই কি নাচবার সময়?

গোদা বানরটা নেচেই চলেছে, নেচেই চলেছে। গাছের ডালে বসে অন্য বানররা যেন এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়ে হাসছে। একজন মানুষের এরকম অসহায় অবস্থা দেখে বুঝি খুব মজা পাচ্ছে ওরা?

হঠাৎ অন্য বানররা একসঙ্গে হুপ-হুপ চিৎকার করে আর-একটা গাছে চলে গেল, সেখান থেকে আর-একটা গাছে। গোদা বানরটাও লাফিয়ে ওপরে উঠে গেল। তারপর তারা ঢুকে গেল গভীর জঙ্গলে।

কাকাবাবু বেশ হতাশ হয়ে পড়লেন।

কিছু উপকার হল না ওদের দিয়ে। বানর তো বানরই! সাধে কি আর লোকে বাঁদর বলে গালাগালি দেয়!

আবার সব চুপচাপ। তেমন কোনও পাখিও ডাকছে না। একটু দূরে একটা গাছতলায় একঝাঁক ছাতারে পাখি কিচুলু মিচুলু করছে। ওরা সবসময় ছ-সাতটা পাখি একসঙ্গে থাকে আর মনে হয় যেন ঝগড়া করছে নিজেদের মধ্যে। এদিকে যে একটা মানুষ রয়েছে, তা ওরা গ্রাহ্যও করছে না।

আর কিছু নেই, অনেকক্ষণ আর কিচ্ছু নেই।

কাকাবাবুর একটু ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা বিকট শব্দে তিনি চমকে উঠলেন।

ঘুমের মধ্যে যেটা বিকট শব্দ, সেটা আসলে ময়ূরের ডাক। ময়ূর দেখতে এত সুন্দর, কিন্তু তার ডাক এত কর্কশ! ছাতারে পাখিগুলো উড়ে গেছে। খুব কাছের একটা গাছের ডালে কখন এসে বসেছে একটা ময়ূর। বেশ বড় ময়ূর, অনেকখানি লম্বা ল্যাজ।

এত কাছ থেকে এরকম একটা সুন্দর ময়ূর কাকাবাবু আগে দেখেননি। ঠিক যেন একটা ছবি। ময়ূরটা এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাচ্ছে। আর তার লম্বা গলায় ঝিলিক দিচ্ছে ময়ূরকণ্ঠী রং।

কিন্তু এই কি সুন্দর জিনিস দেখার সময়!

তবু কাকাবাবু একদৃষ্টে ময়ুরটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তবু তো একটা জীবন্ত প্রাণী, যেন একজন সঙ্গী!

পায়ে সুড়সুড়ি লাগতেই কাকাবাবু নীচের দিকে তাকালেন। এই রে, পিঁপড়ে আসতে শুরু করেছে! লাল পিঁপড়ে। সর্বনাশ! কালো পিঁপড়েরা নিরীহ হয়, গায়ের ওপর দিয়ে ঘোরাঘুরি করলেও কামড়ায় না। কিন্তু লাল পিঁপড়েগুলো কুটুস কুটুস করে কামড়ায়,

ওইটুকু প্রাণী, তবু কী বিষ! লাল পিঁপড়ে আর কালো পিঁপড়ের এত তফাত কেন? এরা টের পায়ই বা কী করে? কাকাবাবুর পা বেয়ে-বেয়ে উঠে এসে ঢুকে পড়ছে কোটের পকেটে।

সামান্য পিঁপড়েদের জন্য কাকাবাবু ময়ুরটার কথাই ভুলে গেলেন।

পিঁপড়ের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। এখন কাকাবাবুর কোটের পকেটে শুধু নয়, সারা গায়ে ছড়িয়ে গেছে পিঁপড়ে। যেখানে সেখানে কামড়াচ্ছে, কাকাবাবু ছটফট করতে লাগলেন। চুলকোচ্ছে সারা গা, কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। তিনি ভাবলেন, বাঘ-ভালুকের দরকার নেই, পিঁপড়ের কামড়েই তিনি শেষ হয়ে যাবেন।

ময়ূরটা কখন উড়ে গেছে তিনি টেরও পাননি।

পিঁপড়েদের শেষ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলল তাদের অত্যাচার। কিছুই যখন করার উপায় নেই, কাকাবাবু তখন চোখ বুজে ভাবতে লাগলেন সন্তুর কথা। সন্তুকে একটা খবর পাঠাতে হবে। ওয়্যারলেসে যেমন খবর পাঠানো যায়, তেমনই মানুষের চিন্তারও তো তরঙ্গ আছে। মনটাকে একাগ্র করে খুব তীব্রভাবে একজনের কথা চিন্তা করলে সে সাড়া দেবে না?

কাকাবাবু চোখ বুজে মনে-মনে বলতে লাগলেন, সন্তু, সন্তু, চলে আয়, তোকে আসতেই হবে। আমি একটা জঙ্গলের মধ্যে রয়েছি, কোথায় ঠিক জানি না, তোকে খুঁজে বের করতে হবে। তুই পারবি না? চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই পারবি। সারারাত এই জঙ্গলে যদি হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমাকে থাকতে হয়, তা হলে আমি পাগল হয়ে যাব! তুই আয় সন্তু, তুই আয়, তুই আয়

ভালুক দুটো এল বিকেলের দিকে। টিকেন্দ্রজিৎ যা-যা বলেছিল, ঠিক মিলে যাচ্ছে। পিঁপড়েরা এখনও আছে, চকোলেট-লজেন্সগুলো নিশ্চয়ই শেষ হয়ে গেছে, এখন তারা সারা শরীরে ঘুরে-ঘুরে আরও কিছু খুঁজছে, কামড়াচ্ছে মাঝে-মাঝে।

ভালুক দুটো ঠিক যেন বেড়াতে বেরিয়েছে। মাঝে-মাঝে ওরা চার পায়ে হাঁটছে, এক-এক বার দু পায়ে ভর দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়াচ্ছে। গাছের গুঁড়ি থেকে খুঁটে-খুঁটে তুলে কী খাচ্ছে কে জানে! ওদের থাবায় বড়বড় নখ! ওই নখ দিয়ে মানুষের গা চিরে দিতে পারে।

কাকাবাবু প্রায় দম বন্ধ করে রইলেন। ভালুকের দৃষ্টিশক্তি ভাল নয়, বেশি দূর দেখতে পায় না। কোনও রকম শব্দ করলে চলবে না।

সকালবেলা টিকেন্দ্রজিতের লোকেরা যে জায়গাটায় বসে ছিল, ঠিক সেই জায়গায় ভালুক দুটো ঘুরতে লাগল। কিছু যেন গন্ধ পেয়েছে। কাকাবাবুর গাছটা মাত্র দশ-বারো হাত দূরে। ওরা এখনও এদিকে তাকায়নি।

সূর্য অস্ত গেছে, আকাশে লাল রঙের আলো এখনও রয়েছে। জঙ্গলের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে আসছে আস্তে-আস্তে। কাকাবাবু একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ভালুক দুটোর দিকে। ওরা চলে যাচ্ছে না কেন? এই জঙ্গলে, ভালুকের হাতে প্রাণ হারাতে হবে, এটা এখনও তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না! বাঁচতে হবেই। টিকেন্দ্রজিতের ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে না? পৃথিবীর যে-কোনও জায়গাতেই টিকেন্দ্রজিৎ লুকোক না কেন, কাকাবাবু তাকে ঠিক খুঁজে বের করবেনই। তাকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে।

ভালুক দুটো কাকাবাবুর অস্তিত্ব টের পায়নি বটে, কিন্তু চলেও যাচ্ছে না। ঘুরঘুর করছে এক জায়গায়। কাকাবাবু ভাল করে শ্বাস নিতে পারছেন না। তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছে। এবার বুঝি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবেন! সন্তুরা এখনও আসছে না কেন?

পেছন দিকের জঙ্গলে সরসর শব্দ হতেই কাকাবাবু সেদিকে ঘাড় ঘোরালেন। ভালুক দুটোও সেই শব্দ শুনতে পেয়েছে, তারা একটু একটু করে পিছিয়ে গেল একটা ঝোপের দিকে।

কাকাবাবুকে দারুণ অবাক করে দিয়ে সাইকেল চেপে একজন লোক হাজির। হল সেখানে। অস্পষ্ট আলোতেও কাকাবাবু চিনতে পারলেন। জলিল শেখ!

সে নিশ্চয়ই ভালুক দুটোকে দেখতে পায়নি। নিশ্চিন্তভাবে সাইকেলটাকে একটা গাছের সঙ্গে হেলান দিয়ে রাখল। তারপর কাঁধের থলে থেকে মস্ত বড় একটা ছোরা বের করে দাঁড়াল এসে কাকাবাবুর সামনে।

কাকাবাবু কটমট করে তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটুও ভয় না। পেয়ে ধমকের সুরে বললেন, আমাকে খতম করে দিতে এসেছ! একজন হাত-পা বাঁধা লোককে মারতে বীরত্ব লাগে না। মারতে চাও, মারো, কিন্তু জেনে রেখো, এর শাস্তি তুমি পাবেই। তোমাকে আমি ফাঁসিতে ঝোলাবই।

জলিল শেখ হাউহাউ করে কেঁদে উঠল।

তারপর দ্রুত কাকাবাবুর হাত-পায়ের বাঁধন কাটতে কাটতে বলতে লাগল, বাবু, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি পাপ করেছি, তার শাস্তিও পেয়েছি। আমার মেয়েটা, সে আমার নয়নের মণি, সে নেই!

কাকাবাবু চমকে গিয়ে বললেন, তোমার মেয়ে ফিরোজা ... সে নেই মানে?

জলিল শেখ ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, কাল তাকে আমি খুব মেরেছিলাম। কাল আমি আবার পাখি ধরে বাড়িতে রেখেছিলাম, মেয়েটা খাঁচা খুলে সব পাখি ছেড়ে দিল। আমার রাগ হয়ে গেল খুব, তাই তাকে মারলাম। মেয়েটা রাত্তিরে কিছু খায়নি। আজ সকালে বাড়ি ফিরে দেখি, সে নেই। কে বলল, সে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, কেউ বলল, জঙ্গলে চলে গেছে ... বাবু, আমার ওই একমাত্র মেয়ে ... আমি এত বড় পাপী ...

হাত-পায়ের বাঁধন মুক্ত হওয়ার পরই কাকাবাবু ক্রাচ দুটোর অভাব বোধ করলেন। গাছে হেলান দিয়ে সারা গা চুলকে পিঁপড়ে তাড়াতে-তাড়াতে বললেন, অতটুকু মেয়ে, সে

কোথায় যাবে? ভাল করে খোঁজ করা গিয়ে। তুমি যে আমায় ছেড়ে দিলে, টিকেন্দ্রজিৎ যদি জানতে পারে?

জলিল শেখ বলল, ওসবের আর আমি পরোয়া করি না। আর আমি পাপ কাজ করব না। না খেয়ে যদি মরতে হয় সেও ভাল।

কাকাবাবু বললেন, কাছাকাছি দুটো ভালুক রয়েছে।

জলিল শেখ যেন সেকথা শুনতেই পেল না। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এখান থেকে নিজে নিজে ফিরে যেতে পারবেন?

কাকাবাবু বললেন, ক্রাচ ছাড়া আমি হাঁটতে পারি না। রাত্তির হয়ে গেলে জঙ্গলের রাস্তাও চিনতে পারব না।

জলিল শেখ বলল, আপনাকে আমার সাইকেলের পেছনে বসিয়ে নিয়ে যেতে পারি। ডাকবাংলোর কাছে ছেড়ে দেব। আমার মেয়েটা যে কোথায় গেল!

কাকাবাবু ওর সঙ্গে কথা বললেও একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সামনের জঙ্গলের দিকে। দুটো ছায়া যেন দুলতে-দুলতে এগিয়ে আসছে।

কাকাবাবু বললেন, জলিল, তোমার পেছনে ভালুক!

জলিল ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, ওরে বাপ রে!

কাকাবাবু বললেন, তোমার ছোরাটা শিগগির আমাকে দাও। তোমার কাছে আর কোনও অস্ত্র আছে?

জলিল বলল, আজ্ঞে না। হ্যাঁ, মানে একটা গুলতি আছে।

কাকাবাবু বললেন, ও দিয়ে কিছু হবে না। আমার পেছনে এসে চেঁচাও, খুব জোরে চেঁচাতে থাকো!

কাকাবাবু ছোরাটা সামনে উঁচু করে ধরে রইলেন। সারাদিন হাত-পা বাঁধা ছিল, শরীরে রক্ত-চলাচল হয়নি ঠিকমতো, দারুণ ক্লান্ত লাগছে, তবু লড়তে তো হবেই। জলিলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনিও চেঁচাতে লাগলেন, আয়, আয় দেখি তোদের গায়ে কত জোর!

ভালুক দুটো খানিকটা এসে থমকে গেল। মনে হল, কতা-গিন্নিতে বেড়াতেই বেরিয়েছে, এখন মারামারি করার ইচ্ছে নেই। চেঁচামেচি শুনে বিরক্ত হয়ে আবার পেছন ফিরে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

জলিল সাইকেলটা কাছে এনে বলল, উঠে পড়ুন স্যার, তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন।

এর মধ্যেই অন্ধকার হয়ে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে পায়েচলা পথও নেই। ঝোপঝাড় ঠেলেঠুলে এগোতে হচ্ছে। একবার তো একটা গাছে ধাক্কা খেয়ে উলটেই পড়ে গেলেন দুজনে।

আবার সাইকেলটা সোজা করার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ডাকবাংলোতে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

জলিল বলল, তা আজ্ঞে চার-পাঁচ ঘণ্টা লেগে যাবে!

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এত দূর! সমস্ত শরীরে ব্যথা। মনে-মনে বললেন, টিকেন্দ্রজিৎ, কোথায় পালাবে তুমি? তোমার ওপর এর সব কিছুর প্রতিশোধ আমি নেবই!

আরও কিছুক্ষণ যাওয়ার পর দেখা গেল দূরে একটা আলো। আলোটা এগিয়ে আসছে। তারপর শব্দ পাওয়া যেতেই বোঝা গেল, সেটা একটা গাড়ির হেডলাইট। একটা গাড়ি আসছে এদিকে। শত্রুপক্ষ, না মিত্রপক্ষ? হয়তো টিকেন্দ্রজিই কোনও লোককে পাঠিয়েছে তার বন্দির অবস্থাটা দেখবার জন্য!

সাইকেলটা থামিয়ে জলিল আর কাকাবাবু একটা বড় গাছের আড়ালে লুকোলেন। যদি শত্রুপক্ষ হয়, তা হলে ধরা পড়ে গেলে খুবই বিপদ। ওদের কাছে বন্দুক-পিস্তল থাকলে লড়াই করা যাবে না।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, জলিল, তুমি পালাও। শব্দ না করে দূরে সরে যাও।

জলিল বলল, আপনাকে ফেলে আমি পালাব? কিছুতেই না।

গাড়িটা আসছে আস্তে-আস্তে। একটা জিপগাড়ি। ভেতর থেকে কেউ টর্চের আলো ফেলছে। এদিক-ওদিক।

কাকাবাবু হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ডাকলেন, সন্তু!

সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থেকে সাড়া এল, কাকাবাবু!

কাকাবাবু বুক খালি করে নিশ্বাস ছাড়লেন। সন্তুকে তিনি মনে-মনে ডাক পাঠিয়েছিলেন, সন্তুকে আসতেই হবে। শুধু একটু দেরি হয়েছে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে এসে সন্তু কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরল। ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞেস করতে লাগল, কী হয়েছিল? কে এখানে ধরে এনেছিল? তোমার কোনও ক্ষতি হয়নি তো, আমরা সারাদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

কাকাবাবু কোনও কথা বললেন না। সন্তুর কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে এসে জিপ গাড়িটার সামনের সিটে বসলেন।

তারপর বললেন, বড্ড ক্লান্ত রে আমি, ঘুম পাচ্ছে, পরে সব বলব! তাঁর মাথা ঝুঁকে এল বুকে, তিনি ঘুমিয়েই পড়লেন সঙ্গে-সঙ্গে।

৮. তেজপুর থেকে শিলচরে

তেজপুর থেকে শিলচরে চলে আসার পর কেটে গেল সাতটা দিন। এর মধ্যে কাকাবাবু আর সার্কিট হাউস থেকে বেরোলেনই না। শুধু বিছানায় শুয়ে-শুয়ে বিশ্রাম। এর মধ্যে সন্তু আর জোজো বেড়িয়ে এল দুটো চা বাগানে। সেখানে তাদের খাতির যত্ন করে খুব খাওয়ানো-দাওয়ানো হয়েছে। চা-বাগানের আতিথেয়তা খুব বিখ্যাত।

ঘর থেকে না বেরোলেও কাকাবাবু টেলিফোনে নানা রকম খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। জলিল শেখের বাড়ির কাছে গোপনে পুলিশ পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে হঠাৎ এসে তাকে কেউ না মারতে পারে। কেউ আসেনি এ-পর্যন্ত। তবে দুঃখের বিষয় তার মেয়েটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনও।

টিকেন্দ্রজিতের কোনও পাত্তা নেই। তেজপুরে তাকে আর দেখাই যাচ্ছে না। কাকাবাবু মণিপুর রাজ্যের পুলিশের বড় কর্তাকে ফোন করেছিলেন। ইম্ফল শহর থেকে খানিকটা দূরে তার একটা বাড়ি আছে বটে, কিন্তু সেখানে ফেরেনি টিকেন্দ্রজিৎ। সে বাড়ির লোকেরা তার কোনও সন্ধান জানে না।

কাকাবাবু সেসব শুনে আপনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, দেখা হবে, ঠিক ওর সঙ্গে আবার দেখা হবে।

সকালবেলা কাকাবাবু দোতলার বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে বসলেন। পায়ের ওপর রোদ এসে পড়েছে, ভারী আরাম লাগছে। স্থানীয় একটা খবরের কাগজ দিয়ে গেছে। তার প্রথম পাতাতেই বড়বড় অক্ষরে খবর, কাজিরাঙার জঙ্গলে চিরুনি-তল্লাশ। ফরেস্ট গার্ড ও পুলিশবাহিনী সমস্ত জঙ্গলে অভিযান চালাচ্ছে দিনের পর দিন। বেআইনিভাবে গাছ কাটার জন্য ধরা পড়েছে পাঁচজন লোক, জেলখানা থেকে পলাতক দুজন আসামী এক জায়গায় লুকিয়ে ছিল, তারাও ধরা পড়েছে। একটা আহত লেপার্ডকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে, সব কাজই চলছে বেশ ভালভাবে। এই কদিন বিশ্রাম নিয়ে কাকাবাবু আবার চাঙ্গা

হয়ে উঠেছেন। দু-একবার তিনি শূন্যে ঘুসি চালিয়ে দেখলেন, হাতের জোর ঠিক আছে কি না।

সন্তু আর জোজো নদীর ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। ফিরে এল ব্রেকফাস্টের সময়। রোজ-রোজ টোস্ট আর ওমলেটের বদলে খানসামা আজ দিয়ে গেল গরম-গরম পুরি আর আলু-ফুলকপির তরকারি। তরকারিটার দারুণ স্বাদ হয়েছে, জোজো দু বার চেয়ে নিল। কাকাবাবু বললেন, কলকাতায় ফিরে গিয়ে ওজন নিলে দেখা যাবে, আমাদের তিনজনেরই ওজন বেড়ে গেছে। বাইরে বেড়াতে এলে বেশি খাওয়া হয়ে যায়।

জোজো বলল, আমার কোনও প্রবলেম নেই। একদিন এমন যোগব্যায়াম করে নেব যে, তাতেই আবার অনেকটা ওজন কমে যাবে।

সন্তু বলল, তুই মোটে একদিন যোগব্যায়াম করবি?

জোজো বলল, একদিন যথেষ্ট। এ তোদের এলেবেলে যোগ ব্যায়াম নয়। বাবার সঙ্গে যখন তিব্বতে গিয়েছিলাম, তখন একজন আসল লামা আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। এক দিনেই এক বছরের কাজ হয়ে গেছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তিব্বতেও গেছ বুঝি?

জোজো বলল, বাঃ, যেবারে চায়না গেলাম, সেবারই তো। জানেন কাকাবাবু, একটুর জন্য আমার লেভিটেশান শেখা হল না। তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হল যে!

সন্তু বলল, লেভিটেশান মানে মাটি থেকে ওপরে উঠে যাওয়া?

জোজো বলল,। তুই মানেটা জানিস দেখছি। মাটিতে পদ্মাসনে বসে আছিসতো, যোগবলে পুরো শরীরটাই মাটি থেকে একটু-একটু ওপরে উঠে যাবে।

সন্তু বলল, যাঃ, তা কখনও হয় নাকি? মাধ্যাকর্ষণ আছে না?

জোজো বলল, নিশ্চয়ই হয়। নাহলে লেভিটেশান কথাটা তৈরি হল কী করে?

তুই নিজের চোখে দেখেছিস কোনও লামাকে সে রকম ওপরে উঠতে?

আলবাত দেখেছি। আমার গুরুই তো করে দেখালেন।

বাজে কথা, টিনটিন ইন টিবেট বইতে এরকম একটা ছবি আছে, তুই সেটা দেখে বলছিস!

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন।

কথা ঘোরাবার জন্য জোজো বলল, কাকাবাবু, পূর্ণিমা কবে?

কাকাবাবু বললেন, কালকে।

জোজো বলল, তা হলে আজ কি আমরা তেজপুরে ফিরে যাব?

কাকাবাবু বললেন, আমরা রওনা হব কাল সকালে। তেজপুরে যাব না, সোজা জঙ্গলে ঢুকব।

সন্তু বলল, জানো কাকাবাবু, জোজোর ধারণা, সব জায়গায় একই দিনে পূর্ণিমা হয় না। আমার সঙ্গে তর্ক করছিল।

কাকাবাবু বললেন, সে কী হে জোজো! আকাশে কি একটার বেশি চাঁদ আছে নাকি?

জোজো বলল, তা নয়। গরম কিংবা শীত যেমন এক-এক জায়গায় কম বা বেশি হয়, তেমনই জ্যোৎস্নাও কম-বেশি হতে পারে না?

কাকাবাবু বললেন, অনেকদিন আগে একটা মজার কথা শুনেছিলাম। রাস্তা দিয়ে একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে, আর এক জন লোক তাকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা দাদা, আকাশে ওটা কী, চাঁদ না সূর্য? প্রথম লোকটা আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বলল, আমি ঠিক বলতে পারছি না। আমি এখানে নতুন এসেছি।

সন্তু হা-হা করে হেসে উঠল। তারপর বলল, নিশ্চয়ই ওই লোকটা জোজো!

কাকাবাবু বললেন, না রে, জোজো কখনও কোনও ব্যাপারে আমি জানি বলে না।

জোজো মুচকি হেসে বলল, আমি সব ব্যাপারই সন্তুর থেকে একটু-একটু বেশি জানি তো, তাই সন্তু আমাকে হিংসে করে।

সন্তু বলল, আমি মোটেই সবজান্তা হতে চাই না। জ্যাক অব অল ট্রেস, মাস্টার অব নান।

কাকাবাবু বললেন, এ কী রে, তোরা ঝগড়া করছিস নাকি?

জোজো বলল, এখানে আমাদের কোনও কাজ নেই তো, তাই মাঝে-মাঝে একটু ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে।

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, তোমাদের কিছু একটা কাজ দরকার, তাই না? শিলচর শহরে আর কিছু দেখবার নেই। একটা কাজ করতে পারো। সন্তু, তোর জাটিঙ্গার কথা মনে আছে তো?

সন্তু কিছু বলার আগেই জোজো বলল, জাটিঙ্গার পাখি তো? সেই যে রাত্তিরবেলা আগুন জ্বাললে ওপর থেকে ঝুপঝুপ করে পাখি এসে পড়ে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেটা আজ দেখে আসি।

কাকাবাবু বললেন, এখন আর পাখি দেখা যাবে না। আগুন জ্বালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তবে জায়গাটা সুন্দর, নদীর ধার দিয়ে দিয়ে রাস্তা, বেড়াতে ভাল লাগবে। তোমরা দুজনে ঘুরে আসতে পারো।

জোজো বলল, কী করে যাব? আপনি পুলিশকে বলে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন।

কাকাবাবু সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমরা যখন ওখানে গিয়েছিলাম তখন বিশেষ কিছুই ছিল না। এখন একটা ভাল হোটেল হয়েছে। তোমরা সেই হোটেলে গিয়ে উঠতে পারো। শুনেছি, সেই হোটেলের মালিক হিম্মত রাও।

এই নামটা শুনেই সন্তু সচকিত হয়ে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, আমি গেলে আমার এই খোঁড়া পা আর গোঁফ দেখে চিনে ফেলতে পারে। তোমাদের হয়তো চিনবে না। তোমরা ভাব দেখাবে যেন পাহাড়ে বেড়াতে গেছ। গাড়ির বদলে ট্রেনে করে চলে যাও কাল ভোরে ফিরে আসবে।

জোজো বলল, আমি চোখে সান গ্লাস আর মাথায় একটা টুপি পরে নেব, কেউ চিনতে পারবে না।

কাকাবাবু বললেন, তোমাদের বিশেষ কিছু করতে হবে না। ভাল করে খাবে, কাছাকাছি স্টেশনে, বাজারে ঘোরাঘুরি করবে। শুধু কান খোলা রেখে শুনবে। কেউ টিকেন্দ্রজিৎ সম্পর্কে কিছু বলে কি না। খবরদার, তোমরা নিজে থেকে টিকেন্দ্রজিতের নাম একবারও উচ্চারণ করবে না, কোনও আগ্রহ দেখাবে না। অন্যরা কেউ কিছু বললে শুনে আসবে। কাল সকাল নটার মধ্যে ফিরে আসা চাই। ভোর পাঁচটায় ফেরার ট্রেন আছে।

মিনিট দশেকের মধ্যে তৈরি হয়ে সন্তু আর জোজো কাঁধে দুটো ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

এই ট্রেনটা বেশ মজার। সরু লাইন, তার ওপর ছোট ট্রেন। দূর থেকে মনে হয় খেলনা গাড়ি। কিন্তু দিব্যি কু-ঝিক-ঝিক শব্দ করতে করতে চলে। কামরার মধ্যে শুধু মুখোমুখি দুটি বেঞ্চ। এদিককার ট্রেনে নানা জাতের মানুষ দেখা যায়। কত রকম পোশাক, কত রকম ভাষা। টুকটুকে ফরসা দু-তিনটে বাচ্চা ছোটাছুটি করছে, ঠিক যেন জ্যান্ত পুতুল।

জানলার ধারে মুখোমুখি বসেছে দুজনে। পাহাড়ের পর পাহাড় চলেছে। নদীটাকে মাঝে-মাঝে দেখা যায়, শীতকাল বলে জল খুব কম। বর্ষার সময় এই নদী দেখে চেনাই যাবে না।

জোজো বলল, শোন সন্তু, কাকাবাবু না থাকলে আমি দলের লিডার। কারণ তোর থেকে আমি দু মাস দশ দিনের বড়। আমার কথা শুনে চলবি। দ্যাখ না ওই ব্যাটা বদমাশ টিকেন্দ্রজিৎটা সম্পর্কে কত খবর জোগাড় করে আনব।

সন্তু ঝুঁকে জোজোর হাঁটুতে জোরে একটা চিমটি কাটল।

জোজো অবাক হয়ে তাকাতেই সন্তু বলল, কাকাবাবু ওই নামটা উচ্চারণ করতে বারণ করে দিয়েছেন না? তুই এর মধ্যেই শুরু করলি?

জোজো বলল, ও, স্যরি, স্যরি। ঠিক আছে, এখন থেকে বলব শুধু টি, তা হলে কেউ বুঝতে পারবে না। ওই টি ব্যাটা কাকাবাবুকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল।

সন্তু বলল, আমার মনে হয় কাকাবাবু শব্দটাও আমাদের উচ্চারণ করা ঠিক নয়। ওই নামটাও অনেকে চিনে গেছে।

জোজো বলল, আমরা তো বাংলায় বলছি, কে বুঝবে?

সন্তু বলল, এখানে অনেকেই বাংলা বোঝে।

জোজোর পাশেই বসে আছে মাথায় পাগড়ি ও মুখভর্তি দাড়ি গোঁফওয়ালা এক মাঝবয়েসী সর্দারজি। তিনি গোঁফের ফাঁক দিয়ে হেসে বলেন, আমি বাংলা বুঝতে পারি!

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, ও, আপনি বাংলা বুঝতে পারেন? আসলে কি হয়েছিল জানেন, আমাদের কাকাবাবুর খাবারের থালায় একটা টিকটিকি পড়ে গিয়েছিল, উনি দেখতে

পাননি। সেই খাবার খেয়ে ওঁর অসুখ হয়ে গেল, একেবারে মরো-মরো অবস্থা। যাই হোক বেঁচে গেছেন শেষপর্যন্ত। সেই থেকে টিকটিকিদের ওপর আমাদের খুব রাগ।

সদারজি হাসিটাকে চওড়া করে বলেন, আমি বাংলা বুঝতে পারি। আমি বাংলা বুঝতে পারি! আই নো ওনলি দিস সেন্টেন্স ইন বেঙ্গলি।

এবার সন্তুও হাসতে লাগল।

নদীর নাম জাটিঙ্গা, সেই নামেই স্টেশন। তার আগে একটা স্টেশনের নাম হারাংগাজাও। নামগুলো শুনলেই কেমন যেন রোমাঞ্চ হয়।

সন্তু এদিকে আগে এসেছে, তার সব চেনা। এখান থেকে হাফলং পাহাড়ের ওপরের শহরটায় যাওয়া যায়। আগের বার সেখানে কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডই না হয়েছিল!

স্টেশন থেকে বেরিয়ে একটু এগোতেই চোখে পড়ল একটা নতুন দোতলা বাড়ি। সেটাই হোটেল। বাইরে সাইনবোর্ড লেখা আছে রিভারভিউ হোটেল। ফুডিং অ্যান্ড লজিং।

সন্তু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ইস, ইংরেজি ভুল। ফুডিং আবার হয় নাকি? ফুড অ্যান্ড লজিং!

জোজো বলল, তোকে মাস্টারি করতে হবে না। ইন্ডিয়ান ইংরেজিতে ওসব চলে!

গেট দিয়ে ঢুকেই অফিস ঘর। কাউন্টারে একটি লোক বসে আছে, তার পেছনের দেওয়ালে একজন বিশাল চেহারার লোকের ছবি বাঁধানো। হিম্মত রাও। এই হোটেলের মালিক কে, তা আর বলে দিতে হবে না।

ওরা দুটো বিছানাওয়ালা একটা ঘর নিল দেড়শো টাকায়। দোতলার ওপর ঘর। সামনে একটা গোল বারান্দা। সেই বারান্দায় দাঁড়ালে প্রায় একেবারে নীচেই দেখা যায় নদীটাকে। তার ও পাশে পাহাড়। পাহাড়ের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে একটা গাড়ি চলার রাস্তা চলে গেছে। জায়গাটা সত্যি সুন্দর!

জোজো বলল, কাকাবাবু আমাদের ভাল করে খেতে বলেছেন। এখন দুপুর সাড়ে বারোটা, তা হলে খাবারের অর্ডার দেওয়া যাক।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, তুই চান করবি না? বেশ পরিষ্কার বাথরুম আছে।

জোজো বলল, এই শীতের মধ্যে প্রত্যেক দিন চান করতে হবে তার কোনও মানে নেই।

দু-তিন বার বেল টিপতে একজন বেয়ারা এসে দাঁড়াল দরজার কাছে।

খাটের ওপর বসে জুতো খুলতে-খুলতে জোজো জিজ্ঞেস করল, হাঁ ভাই, দুপুরের খাবার কী পাওয়া যাবে?

বেয়ারাটি বলল, কী খাবেন বলুন? চিকেন, মটন, এগ কারি।

জোজো বলল, মাছ পাওয়া যাবে না?

বেয়ারাটি বলল, না, এখানে বোজ মাছ আসে না। কাল পেতে পারেন।

জোজো বলল, তা হলে আমরা চিকেন আর মটন দুটোই খাব। আর ডালের সঙ্গে ফুলকপির তরকারি আর বেগুন ভাজা হবে তো?

সন্তু বলল, ওরে জোজো, আমি তোর মতন তিব্বতি যোগ ব্যায়াম জানি। আমি অত খেতে পারব না।

জোজো সেকথায় কান না দিয়ে বলল, এক প্লেটে ক টুকরো চিকেন থাকে?

বেয়ারাটি বলল, হাফ প্লেট দু টুকরো, ফুল প্লেট চার টুকরো।

জোজো বলল, তা হলে ফুল প্লেট। চিকেন, মটন, দুটোই ফুল প্লেট।

বেয়ারাটি বলল, ডাইনিং হলে গিয়ে খাবেন, না ঘরে খাবেন?

জোজো বলল, ঘরে, ঘরে। এখন কোথাও যেতে পারব না। কতক্ষণে খাবার আনতে পারবে?

বেয়ারাটি বলল, এক ঘণ্টা তো লাগবেই। মাংস এখনও চাপেনি।

জোজো প্রায় আঁতকে উঠে বলল, ওরে বাবা, এক ঘণ্টা দেরি! দারুণ খিদে পেয়েছে। ট্রেন জার্নি করলেই আমার খিদে পায়। তুমি তা হলে ততক্ষণে দুটো ডাবল ডিমের ওমলেট করে নিয়ে এস। তাতে তো দেরি হবে না।

জামার পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে বেয়ারাটির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, তোমার নাম কী ভাই?

বেয়ারাটি টাকা নিয়ে ছোট্ট সেলাম জানিয়ে বলল, আমার নাম সেলিম।

জোজো উঠে এসে তার কাঁধ চাপড়িয়ে বলল, বাঃ, বেশ নাম। দেখো, ওমলেট দুটো যেন নরম-নরম হয়। আচ্ছা সেলিম, তুমি টিকেন্দ্রজিৎকে চেনো?

সেলিম বলল, কে?

সন্তু কটমট করে তাকাল জোজোর দিকে।

জোজো অমনই গলা নিচু করে বলল, ত্রিলোকচাঁদজি, তাই না? নামগুলো উলটোপালটা হয়ে যায়। ত্রিলোকচাঁদজি কাঠের ব্যবসা করেন, তিনি কি এই হোটেলে উঠেছেন?

সেলিম বলল, জানি না তো!

জোজো বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে, যাও, ওমলেট নিয়ে এসো!

সেলিম চলে যেতেই জোজো রামভক্ত হনুমানের মতন হাতজোড়া করে রইল সন্তুর দিকে।

সন্তু বলল, তুই যে ডোবাবি দেখছি! তুই আবার ...

জোজো বলল, ক্ষমা চাইছি তো! এবারকার মতন মাফ করে দে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। কী করব! আমার মাথায় সব সময় ওই নামটা ঘুরছে। কাকাবাবুর ওপর অত্যাচার করেছে, ওর কথা ভাবলেই আমার রাগে গা জ্বলে যায়। একবার কাছাকাছি পেলে ওর টুটি চেপে ধরব।

সন্তু বলল, তুই ঘরে খাবার দিতে বললি। ঘরে বসে থাকলে আমরা অন্য লোকের কথা শুনব কী করে? ডাইনিং হলে খেতে গেলে অন্য লোকজন দেখা যেত।

জোজো বলল, ঠিক আছে, ওমলেটটা দিয়ে যাক। অন্য খাবার ডাইনিং হলে গিয়েই খাব। একটা কথা ভেবে দ্যাখ সন্তু। এখানে কেউ নেই, এখন টিকেন্দ্রজিতের নাম উচ্চারণ করা যায়। টিকেন্দ্রজিৎ তো কাকাবাবুকে মেরে ফেলতেই চেয়েছিল, জঙ্গলের মধ্যে কাকাবাবু সারাদিন হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রইলেন, ভালুক-টালুক এল, তবু কাকাবাবু মরলেন না কেন বল তো? আমার বাবার জন্য!

সন্তু বলল, তার মানে?

জোজো বলল, আমার বাবা বলেছিলেন না, কাকাবাবুর ইচ্ছামৃত্যু! উনি নিজে মরতে না চাইলে কেউ ওঁকে মারতে পারবে না!

সন্তু অন্যমনস্কভাবে বলল, হুঁ!

এক ঘণ্টা বাদে ওরা একতলার ডাইনিং হলে এসে দেখল, বেশি লোক নেই। একটা টেবিলে একা একজন আর অন্য একটা টেবিলে তিনজন নারী-পুরুষ বসে খাচ্ছে। হোটেলটার অনেক ঘর খালি।

দূরের টেবিলের তিনজন বাঙালি। তারা লামডিং থেকে আসবার পথে হাতি দেখেছে, সেই গল্প করে যাচ্ছে উত্তেজিতভাবে।

জোজো বলল, ওদের সঙ্গে আলাপ করব?

সন্তু বলল, না। আমাদের কাজ শুধু শুনে যাওয়া।

সেই তিনজন খালি হাতির গল্পই করে যাচ্ছে। আর কোনও কথা নেই।

জোজো বলল, আদেখলা! আর যেন কেউ কখনও হাতি দেখেনি।

অন্য টেবিলের একলা লোকটি গম্ভীরভাবে খেয়ে চলেছে। ওরা এবার তার দিকে মনোযোগ দিল। ওর চেহারাটা রুক্ষ ধরনের। একটা খয়েরি রঙের ঢোলা পাঞ্জাবি পরা।

জোজো বলল, ওই লোকটার পকেটে রিভলভার আছে।

সন্তু বলল, কী করে বুঝলি?

জোজো বলল, দ্যাখ না, বারবার ডান পকেটে হাত দিয়ে দেখছে।

সন্তু বলল, ওর মানিব্যাগে অনেক টাকা থাকতে পারে।

জোজো বলল, টিকেন। সন্তু সঙ্গে-সঙ্গে বলল, আবার?

জোজো বলল, টিকে টিকে! আমি বলছিলাম, আগে আমাদের পক্সের টিকে নিতে হত না? এখন আর নিতে হয় না। কী মজা! অবশ্য গঙ্গাসাগরে যেতে হলে কলেরার টিকে নিতে হয়। খুব লাগে!

সন্তু বলল, কী পাগলের মতন কথা বলছিস!

জোজো বলল, মিঃ টি যে এখানে আসবেই, তার কোনও মানে নেই। হয়তো এখানে কেউ তাকে চেনেই না। আমাদের শুধু-শুধু আসাটাই সার হবে।

সন্তু বলল, বেড়ানো তো হচ্ছে। শুধু-শুধু শিলচরে বসে থাকলে কী লাভ হত?

খাওয়ার পর ওরা বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে।

এখানকার বাজার খুবই ছোট, কয়েকখানা মাত্র দোকান। একটু ঘোরাঘুরি করলেই আর দেখার কিছু থাকে না।

এখানে টিকেন্দ্রজিতের সন্ধান পাওয়া যাবে কী করে? কেউ তো চেঁচিয়ে কোনও গল্প করছে না। ওরা বেড়াতে গেল পাহাড়ের দিকে।

তাও বেশিদূর যাওয়া গেল না। হঠাৎ টিপিটিপি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। একেই দারুণ শীত, তার ওপর বৃষ্টি যেন সুচের মতন বিধতে লাগল। ওরা দুজনে দৌড় লাগাল হোটেলের দিকে।

সন্তু বলল, রেস দিবি, জোজো? কে আগে হোটেলে পৌঁছতে পারে–

জোজো বলল, আমার ফার্স্ট হতে ভাল লাগে না। সবাই বড্ড হিংসে করে। কিন্তু সেকেন্ড আমি হবই।

নিজেদের ঘরে এসে জোজো ধপাস করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। সন্তু ব্যাগ থেকে বের করল একটা ক্যাসেট প্লেয়ার। এখন গান শুনে সময় কাটাতে হবে।

পাহাড়ের দিকে বৃষ্টি সহজে থামে না। বৃষ্টি ছাড়ল সেই শেষ-বিকেলে। সন্তু এসে দাঁড়াল বারান্দায়। এখন আকাশ একেবারে পরিষ্কার, সূর্য ডুবে যাচ্ছে পাহাড়ের আড়ালে। গাছপালাগুলো পরিচ্ছন্ন। সেদিকে তাকিয়ে থাকলে চোখের আরাম লাগে।

জোজো এখনও পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে, সন্তু দু-তিন বার ডেকেছে, তবু ওঠেনি।

পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে সন্তু একসময় দেখতে পেল একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে ওপরের রাস্তা দিয়ে নেমে আসছে। এর আগে দু-একটা ট্রাক আর গাড়ি গেছে ওই রাস্তা দিয়ে, কিন্তু ঘোড়া ছুটতে দেখলে সব সময় ভাল লাগে।

এক সময় সেই অশ্বারোহী থেমে গিয়ে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল। নদীর দিকে মুখ।

সন্তু এবার ঘরের মধ্যে গিয়ে জোর করে ঠেলে তুলল জোজোকে।

জোজো চোখ মুছতে-মুছতে বাইরে এসে বলল, বাঃ, কী সুন্দর ছবি!

সন্তু বলল, ঘোড়ার পিঠে একজন লোককে দেখতে পাচ্ছিস?

জোজো বলল, ওকেও এই ছবিটার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। হে নীল ঘোড়াকা সওয়ার!

সন্তু বলল, ওই লোকটা টিকেন্দ্রজিৎ নয় তো?

জোজো বলল, ধুত! তোর মাথায় খালি ওই নাম ঘুরছে। আমি তো মুছে ফেলেছি। আমি বুঝে গেছি ওই টিকেন্দ্রজিৎ না ফিকেন্দ্রজিৎ এখানে কখনও আসেনি, কেউ তাকে চেনেও না। হিম্মত রাও-এর হোটেল বলেই টিকেন্দ্রজিৎকে এখানে আসতে হবে কেন?

সন্তু বলল, অনেকটা দূর। লোকটাকে ভাল করে দেখা যাচ্ছে না অবশ্য।

জোজো বলল, আর কোনও লোক বুঝি ঘোড়ায় চাপতে পারে না? দুপুরবেলা আমরা বাজারে দুটো লোককে ঘোড়ায় চড়ে যেতে দেখলাম না? তুই চা খেয়েছিস? চল, ডাইনিং রুমে গিয়ে চা খেয়ে আসি।

সন্তুর এই বারান্দা ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। জোজো জোর করল বলে যেতে হল।

এবারেও ঠিক সেই এক টেবিলে তিনজন আর অন্য একটা টেবিলে আর-একজন। বাঙালি তিনজন তিন প্লেট পকোড়া নিয়েছে।

সেলিম এসে কাছে দাঁড়াবার পর জোজো জিজ্ঞেস করল, ওরা কীসের পকোড়া খাচ্ছে?

সেলিম বলল, মাশরুম পকোড়া। খুব ভাল, দেব আপনাদের?

জোজো বলল, নিশ্চয়ই দেবে। আমাদের জন্যও তিন প্লেট নিয়ে এসো!

সন্তু বলল, অ্যাঁ তিন প্লেট কী হবে? আমরা তো দুজন!

জোজো বলল, আনুক না। তোর আর আমার এক প্লেট করে। তার পর আমাদের দুজনের জন্য এক প্লেট।

সেলিম চলে যাওয়ার পর জোজো বলল, তুই এত কিপ্টেমি করছিস কেন রে! কা-আ-আ, মানে আঙ্কেলবাবু আমাদের ভাল করে খেতে বলেছেন না। অনেক টাকা দিয়ে দিয়েছেন।

সন্তু বলল, তার জন্য না। দুপুরে অত খেয়েছি, এখন শুধু চা খেতেই ইচ্ছে করছিল। যা ঠাণ্ডা পড়েছে!

জোজো বলল, তা হলে চা দিয়ে শুরু করলেই হয়।

জোজো দৌড়ে উঠে গিয়ে সেলিমকে আগে চা দেওয়ার জন্য বলে এল।

বাঙালি তিনজন কী গল্প করছে, ওরা কান খাড়া করে শোনবার চেষ্টা করল। এখন চলছে খাওয়ার গল্প। চাইনিজ ভাল, না মোগলাই রান্না? চিকেন চাওমিন আর চিকেন বিরিয়ানির মধ্যে কোনটা রান্না করা বেশি শক্ত? একজন ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোকের মধ্যে এই তর্ক চলছে তো চলছেই। চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি মেয়ে চুপ করে শুধু খেয়ে যাচ্ছে।

খানিকক্ষণ শোনার পর জোজো বলল, হ্যাংলা! বেড়াতে এসেও শুধু খাওয়ার কথা!

সন্তু বলল, আস্তে, শুনতে পাবে!

জোজো বলল, ওই মেয়েটা তোর দিকে আড়চোখে দেখছে। তোকে বোধ হয় চিনে ফেলেছে সন্তু।

সন্তু বলল, আমায় কী করে চিনবে? তুই হচ্ছিস বিশ্বভ্রমণকারী জোজো, তোকেই নিশ্চয়ই চিনেছে।

জোজো বলল, তা হতে পারে। হয়তো আমাকে অন্য কোথাও দেখেছে। চিনে কিংবা মঙ্গোলিয়ায়।

সেলিম শুধু চা দিয়ে গেছে। ওঁদের এক কাপ করে চা শেষ হয়ে গেছে, এখনও মাশরুম পকোড়ার পাত্তা নেই।

অন্য টেবিলের একা লোকটি বসে কিছুই খাচ্ছে না, বসে আছে চুপচাপ।

জোজো হাত তুলে সেলিমকে ডাকতে যাচ্ছে, তখনই বাইরের দরজা খুলে ঢুকল একজন লোক। সেদিকে তাকিয়ে সন্তু আর জোজোর চক্ষুস্থির হয়ে

গেল।

লোকটি ছ ফুটের বেশি লম্বা, কালো রঙের প্যান্ট আর শার্টের ওপর পরে আছে চামড়ার জ্যাকেট। মাথায় টুপি। চোখ দুটি যেন ঝকঝক করছে। অনেক লোকের মধ্যে মিশে থাকলেও এর দিকেই সকলের প্রথম চোখ পড়বে।

জোজো ফিসফিস করে বলল, টিকেন ... টিক ... টিক।

সন্তু টেবিলের তলা দিয়ে তাকে একটা লাথি কষিয়ে বলল, ওদিকে তাকাবি। চায়ে চুমুক দে!

টিকেন্দ্রজিৎ ঘরে ঢুকে প্রথমে চারদিকে তাকিয়ে দেখল।

একলা বসে থাকা গোমড়ামুখো লোকটার মুখে এবার হাসি ফুটেছে। সে টিকেন্দ্রজিতের অপেক্ষাতেই বসে ছিল বোঝা গেল।

টিকেন্দ্রজিৎ তার দিকে এগোবার আগেই সেলিম বেয়ারার কাছে গিয়ে কী যেন বলতে লাগল গুজগুজ করে। টিকেন্দ্রজিতের ভুরু উঠে গেল। সেলিম আঙুল দিয়ে সন্তু-জোজোর দিকেই দেখাচ্ছে।

এবার টিকেন্দ্রজিৎ এগিয়ে আসতে লাগল ওদের টেবিলের দিকে।

জোজোর বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস শব্দ হচ্ছে। সে বলেছিল বটে যে, টিকেন্দ্রজিৎকে দেখামাত্র তার টুটি চেপে ধরবে; এখন সে বুঝতে পারছে, টিকেন্দ্রজিৎ একা তার মতন দশটা জোজোকে টিট করে দিতে পারে। জোজোর ধারণা হল, টিকেন্দ্রজিতের দু পকেটে দুটো রিভলভার আছে। কাছেই এসেই সে ফস করে রিভলভার দুটো বের করে ঢিসুম ঢিসুম করে গুলি চালাবে। বিশ্বাসঘাতক সেলিম তাদের চিনিয়ে দিয়েছে, আর নিস্তার নেই!

সন্তুর মুখোনাও আড়ষ্ট হয়ে গেছে। সে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। টিকেন্দ্রজিৎকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে তার গায়ে অসম্ভব জোর, তারা দুজনে মিলেও ওকে ধরে রাখতে পারবে না। তা ছাড়া এখানে টিকেন্দ্রজিতের দলের লোক আছে। তবু সন্তু মনে-মনে ঠিক করে ফেলল, কিছুতেই টিকেন্দ্রজিতের হাতে ধরা দেওয়া চলবে না। যেমন করে হোক, ওর হাত ছাড়িয়ে পালাতেই হবে।

জুতো মশমশিয়ে টিকেন্দ্রজিৎ ওদের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল, কোমরে দু হাত দিয়ে একটুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, আমায় কে খোঁজ করছে?

দুজনেই মাথা নিচু করে রইল, কোনও উত্তর দিল না।

টিকেন্দ্রজিৎ এবার হেসে বলল, খালি কাপে চুমুক দিচ্ছ কেন? চা ফুরিয়ে গেছে বুঝি?

সত্যি! ওদের দুজনের কাপই একদম খালি।

টিকেন্দ্রজিৎ জোজোর পিঠে এক চাপড় মেরে বলল, এই যে, চুপ করে আছ কেন? তোমার নাম কী?

জোজো মুখ তুলে কাঁপাকাঁপা স্বরে বলল, আমি, আমি তো ত্রিলোকচাঁদজির খোঁজ করছিলাম!

টিকেন্দ্রজিৎ হেসে ফেলে বলল, ত্রিলোকচাঁদ, হা-হা-হা-হা, ওই নামে ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ নেই।

এই সময় বাইরে একটা গাড়ি থামার শব্দ হল।

সেলিম জানলার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে উঁকি মেরেই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে বলল, পুলিশ! পুলিশ এসেছে!

টিকেন্দ্রজিৎ এবার নিজে গিয়ে জানলার কাছে দেখল।

তারপর সেলিমকে ধমক দিয়ে বলল, পুলিশ দেখলে ঘাবড়াবার কী আছে? পুলিশরা হোটেলে খেতে আসতে পারে না? আমার খাবারটা ওপরে দিয়ে আসবি।

টিকেন্দ্রজিৎ জানলার কাছ ছেড়ে শান্ত পায়ে এগিয়ে গেল ওপরের সিঁড়ির দিকে। একবার শুধু জ্বলন্ত চোখে জোজো-সন্তুকে দেখল।

সন্তু সিঁড়িটা পুরো দেখতে পাচ্ছে। টিকেন্দ্রজিৎ দ্রুত টকটক করে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়িটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে একটা গোল ব্যালকনি। সাকাসের খেলোয়াড়ের মতন ব্যালকনির রেলিং টপকে সে লাফিয়ে পড়ল হোটেলের পেছন দিকটায়। তারপরই শোনা গেল ঘোড়া ছোটার খটাখট শব্দ।

এবার দরজা ঠেলে ঢুকল পুরোদস্তুর পোশাক-পরা একজন পুলিশ।

জোজো অমনই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এসেছেন? এত দেরি করলেন কেন?

পুলিশটি বলল, আপনারাই তো সন্তুবাবু আর জোজোবাবু? বর্ণনা ঠিক মিলে গেছে। চলুন, আপ্পাদের আজই শিলচর ফিরতে হবে।

জোজো বলল, আমাদের নিতে এসেছেন তো, ঠিক আছে। দাঁড়ান, আগে মাশরুম পকোড়া খেয়ে যাই। অনেকক্ষণ অর্ডার দিয়েছি।

তারপর সে গর্বিতভাবে বাঙালি তিনজনের দিকে তাকাল। যেন তাদের বুঝিয়ে দিতে চায়, পুলিশ জোজোকে ধরতে আসেনি, বরং সে পুলিশের ওপর হুকুম করতে পারে।

সন্তু তাড়াতাড়ি পুলিশটিকে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, কেন, আমাদের আজই ফিরতে হবে কেন? কাল সকালে ফেরার কথা ছিল। কী হয়েছে?

পুলিশটি বলল, এদিকের মেইন রোডে ধস নেমেছে, কোনও গাড়ি যেতে পারছে না। আপনাদের অন্য রাস্তা দিয়ে ঘুরে-ঘুরে তেজপুর যেতে হবে, তাই আজ শেষ রাত্রেই বেরিয়ে পড়া দরকার। সেই জন্য নিতে এসেছি।

কাকাবাবুর আর কোনও বিপদ হয়নি জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে সন্তু বলল, একটু পরে ফিরলেও হবে। শুনুন, আপনি আসবার আগে এখানে টিকেন্দ্রজিৎ ছিল। এইমাত্র পালাল। এখনও তাকে তাড়া করে গেলে ধরা যেতে পারে।

পুলিশটি বলল, টিকেন্দ্রজিৎ, ওরে বাবা! না, না, আমি ওকে তাড়াটাড়া করতে পারব না।

সন্তু বলল, কেন পারবেন না? আপনার কাছে তো রিভলভার আছে। আমরা তিনজনে মিলে ওকে ধরে ফেলতে পারি।

পুলিশটি বলল, আমার ওপর সে রকম অর্ডার নেই। শিলচরে আপনাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা, ফিরিয়ে নিয়ে যাব, ব্যস! জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন!

সন্তু হতাশভাবে বলল, দুর ছাই!

৯. গভীর জঙ্গলে বড় ঝিলটার কাছে

গভীর জঙ্গলে বড় ঝিলটার কাছে কাকাবাবুরা সদলবলে পৌঁছে গেলেন দুপুরের একটু পরেই। চারটে বড় গাছে মাচা বাঁধা হয়েছে। অন্য গাছের ডাল। কেটে সেই মাচাগুলোর সামনে এমনভাবে ঢেকে দেওয়া হয়েছে যে, তলা থেকে কেউ কিছু বুঝতেই পারবে না।

কাছাকাছি অন্য ঝিলগুলো শুকিয়ে ফেলা হয়েছে বলে এই দিনের বেলাতেই একপাল হরিণ এখানে জল খেতে এসেছিল, মানুষজনের শব্দ পেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল।

কাকাবাবু ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে বড়ঠাকুরকে বললেন, একটা জিনিস লক্ষ করুন। ঝিলটার তিনদিকে বেশ খাড়া পাড়। এক দিকটা ঢালু। জন্তু-জানোয়াররা এই এক দিক দিয়েই আসবে-যাবে। তাতে নজর রাখার সুবিধে হবে।

বড়ঠাকুর বললেন, তা ঠিক। কাকাবাবু, একটা খবর শুনেছেন? কলকাতার চিড়িয়াখানার মধ্যে ঢুকে একটা লোক একটা গণ্ডারের শিং কেটে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। সে করাত-রাত সব সঙ্গে নিয়ে ঢুকেছিল।

কাকাবাবু বললেন, তাই নাকি? তা হলে ওরা কীরকম বেপরোয়া হয়ে গেছে দেখুন! বম্বেতে বিদেশি ব্যবসায়ীরা এসে বসে আছে, তাদের কাছে শিং বিক্রি করার জন্য এরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। অনেক টাকার কারবার।

বড়ঠাকুর বললেন, এর মধ্যে পশ্চিম বাংলার জলদাপাড়ায় একটা গণ্ডার মারা পড়েছে। দুজন ফরেস্ট গার্ড চোরাশিকারিদের ধরতে গিয়েছিল, একজন গার্ড খুন হয়ে গেছে। ওরা একসঙ্গে অনেকে দল বেঁধে আসছে এখন।

কাকাবাবু বললেন, এখানে গণ্ডারের সংখ্যা অনেক বেশি, তাই এখানে হামলা হবে বেশি। অন্য রাজ্য থেকেও চোরাশিকারিরা এখানে এসে জুটবে। মনে হয়, আজকের পূর্ণিমা রাতের সুযোগটা তারা ছাড়বে না।

বড়ঠাকুর বললেন, আমরা আর-একটা রিপোর্ট পেয়েছি। আফ্রিকাতেও অনেক গণ্ডার আছে, কিন্তু তাদের দুটো করে শিং থাকে। আমাদের দেশের গণ্ডারের শিং থাকে একটা। গুজব রটে গেছে যে, ভারতীয় গণ্ডারের শিঙের শক্তি বেশি। এই শিং একটা খেতে পারলেই খুব তাড়াতাড়ি যৌবন ফিরে পাওয়া যায়। সেইজন্যই ভারতীয় গণ্ডারের শিঙের চাহিদা খুব বেড়ে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, গুজবটা নিছকই গুজব। কোনও গণ্ডারের শিং খেলেই কিচ্ছু উপকার হয় না। চোরাব্যবসায়ীরাই এই গুজব রটিয়েছে। ভারতীয় গণ্ডার শিকার করাও খুব শক্ত। আফ্রিকার গণ্ডারের চেয়ে এ-দেশের গণ্ডারের চামড়া অনেক বেশি শক্ত, যেন লোহার বর্মের মতন, গুলি লাগলে ছিটকে যায়। যে জিনিস যত কম পাওয়া যায়, তার তত বেশি দাম বাড়ে।

রাজ সিং সব কটা মাচা ঠিকমতন মজবুত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করে দেখে এসে বললেন, সব ঠিক আছে। যে তিনজন লোক মাচাগুলো বানিয়েছে, তাদের এবার ছেড়ে দেব?

বড় ঠাকুর বললেন, না, না, ওদের ছাড়া হবে না। ওদের হাতে হাতকড়া লাগান। আমার ড্রাইভার খুব বিশ্বস্ত। আমার গাড়িতে ওদের এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে সারা রাত আটকে রাখবে। যাতে ওরা এখন ফিরে গিয়ে এখানে মাচা বাঁধার খবর কাউকে না দিতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ, ভাল ব্যবস্থা।

বড়ঠাকুর বললেন, আমি যতদূর সম্ভব সাবধানে সব ব্যাপারটা গোপন রেখেছি। আমরা যে এখানে আজ আসব, তা কারও জানার কথা নয়। কাকাবাবু, আপনি যা-যা বলেছেন, সব মানা হয়েছে। শুধু একটা ব্যাপার আপনাকে জানানো হয়নি। সেটা আমাকে মানতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর আদেশে।

কাকাবাবু বললেন, সেটাও আমি জানি। এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য আনা হয়েছে তো?

বড়ঠাকুর বললেন, আপনি জেনে গেছেন? মুখ্যমন্ত্রী আপনার প্ল্যানটা সব শুনেছেন। তার পর বললেন, আপনারা এই কজন সেখানে রাত্রে থাকবেন, আপনাদের প্রাণের দায়িত্ব কে নেবে? স্মাগলারদের কাছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র থাকে। আর্মি দিয়ে জায়গাটা ঘিরিয়ে রাখুন। তাই এক ব্যাটেলিয়ন আর্মি আসছে। এরা গাভোয়ালি সৈন্য, খুব বিশ্বাসী, এখানকার ভাষাই বোঝে না। এরা আবার ক্যামোফ্লেজ জানে। গায়ে, মাথার সঙ্গে গাছের ডালপালা বেঁধে এমনভাবে জঙ্গলে মিশে যাবে যে ওদেরও গাছ বলে মনে হবে। আমাদের শচীনকে ওদের কম্যান্ডারের সঙ্গে রাখা হয়েছে, সে সব বুঝিয়ে দেবে।

কাকাবাবু বললেন, ওদের কমান্ডারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। এখান থেকে আধ মাইল দূরে ওরা নিঃশব্দে ছড়িয়ে থাকবে। আমার নির্দেশ না পেলে ওরা নড়বে না, কিছুই করবে না।

বড়ঠাকুর বললেন, তা হলে আমরা এখন ওপরে উঠে পড়ি?

কাকাবাবু ঘড়ি দেখে বললেন, সূর্য অস্ত যেতে এখনও প্রায় এক ঘণ্টা দেরি

আছে। আপনারা এখানে দাঁড়ান, আমি একটু ঝিলটার চারপাশ দেখে আসি।

কাকাবাবু রাধেশ্যাম বড়ুয়ার ঘোড়াটা সঙ্গে এনেছেন, সেটাতে চড়ে তিনি এগিয়ে গেলেন। এই ঝিলটা অন্যগুলোর চেয়ে অনেক বড় হলেও তিনদিকের পাড় বেশ উঁচু, কেউ নামতে গেলে গড়িয়ে পড়ে যাবে। এক দিকটা ঢালু। এর সুবিধে এই যে, এই এক দিকটায় নজর রাখলেই চলবে।

ফিরে এসে কাকাবাবু বললেন, এই বার শুরু হবে আমাদের কঠিন পরীক্ষা। যে যার মাচায় উঠে বসে থাকব, কিন্তু কতক্ষণ যে থাকতে হবে তার ঠিক নেই। হয়ত ওরা আসবে ভোরবেলা। এর মধ্যে আমাদের ঘুমোলে চলবে না, একটাও কথা বলা যাবে না। শুধু ঠায়

বসে থাকা। প্রত্যেকের সঙ্গে খাবারের প্যাকেট থাকবে, তাও খেতে হবে নিঃশব্দে। সন্তু আর জোজো একসঙ্গে থাকলে কথা বলে ফেলতে পারে, তাই ওদের এক মাচায় দিচ্ছি না। সন্তু থাকবে তপনের সঙ্গে, আর জোজো রাজ সিংয়ের মাচায় থাকবে।

তপন রায় বর্মণ জিজ্ঞেস করল, চোরাশিকারিদের দেখতে পেলে আমরা কি গুলি চালাব?

কাকাবাবু বললেন, না, না, খবদার গুলি-টুলি চালাবে না। চুপ করে বসে থাকবে।

তপন বলল, ওরা যদি গণ্ডার মারতে শুরু করে, তা দেখেও আমরা চুপ করে থাকব?

কাকাবাবু বললেন, হ্যাঁ, তাও চুপ করে থাকবে। আমরা বন্দুক এনেছি শুধু আত্মরক্ষার জন্য। ওরা যদি আমাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে যায়, যদি আমাদের আক্রমণ করতে আসে, তা হলেই শুধু আমরা গুলি চালাব। এরা অতি সাঙ্ঘাতিক মানুষ। অনেক টাকার লোভে একেবারে মরিয়া হয়ে গেছে। আমাদের এমনভাবে থাকতে হবে, যাতে ওরা আমাদের অস্তিত্ব কিছুতেই টের না পায়।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে তিনি ঘোড়াটাকে বাঁধলেন গাছের সঙ্গে, তারপর বললেন, তোমরা সবাই যে যার মাচায় উঠে পড়ো। মনে থাকে যেন, একটাও কথা নয়। আমার শুধু একটা কাজ বাকি আছে।

একটা ঝোলা ব্যাগ থেকে তিনি বের করলেন দু খানা জুতোর বাক্সের সমান একটা কাগজের বাক্স। তার থেকে বেরলো সাদা ধপধপে একটা ফেভিকলের বাক্স। চতুর্দিক সেলোটেপ দিয়ে এমনভাবে আটকানো, যাতে একটুও হাওয়া কিংবা জল ঢুকতে না পারে।

বড়ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী?

কাকাবাবু বললেন, এটা আমি আর্মির কাছ থেকে জোগাড় করেছি।

বড়ঠাকুর বললেন, কী আছে এর মধ্যে?

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, সেটা যথাসময়ে জানতে পারবেন। খানিকটা কৌতূহল টিকিয়ে রাখা ভাল, তাই না?

কাকাবাবু সেই বাক্সটা ভাসিয়ে দিলেন ঝিলের জলে।

যে-কটা গাছে মাচা বাঁধা হয়েছে, সেখানে একটা করে দড়ির সিঁড়িও ঝোলানো আছে। যাতে জুতো পরেই ওঠা যায়। এই শীতের মধ্যে খালি পায়ে থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

কাকাবাবু মাচায় উঠে দড়ির সিঁড়িটা গুটিয়ে নিলেন। একপাশে রইল রাইফেল, অন্যপাশে খাবারের প্যাকেট। মাচার ওপর গদি পাতা আছে, বেশ আরামেই বসা যাবে।

এর পর শুধু প্রতীক্ষা।

কাকাবাবু অন্য মাচাগুলোর দিকে তাকালেন। কোন-কোন গাছে মাচা বাঁধা হয়েছে তা তিনি জানেন, তবু কিছু বোঝা যাচ্ছে না। প্রত্যেক মাচা প্রায় দু তলা সমান উঁচু, কোনও জন্তুও এত দূর থেকে মানুষের গন্ধ পাবে না। শীতকাল বলে একটা সুবিধে হয়েছে, হঠাৎ সাপ-টাপ এসে পড়বে না গায়ে। ডালটনগঞ্জে একবার জঙ্গলের মধ্যে লুকিয়ে থাকার সময় গায়ের ওপর দিয়ে সাপ চলে গিয়েছিল।

আকাশের আলো মিলিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার তাড়াতাড়ি নেমে আসে, ওপর দিকটায় আরও কিছুক্ষণ আলো থাকে। উড়ে যাচ্ছে ঝাঁকঝাঁক পাখি। ঝিলের মাঝখানে কয়েকটা শাপলা ফুটে আছে, সেখানে ওড়াউড়ি করছে কিছু ফড়িং আর প্রজাপতি। সব মিলিয়ে বাতাসে একটা সুন্দর শান্ত ভাব।

কাকাবাবু ভাবলেন, জঙ্গল এত সুন্দর, তবু মানুষ এখানে বন্দুক নিয়ে ঢোকে। অকারণে প্রাণিহত্যা করে। এমনকী, মানুষকেও মারে। হিংসার বিষনিশ্বাস ছড়ায়। আজকেই কত খুনোখুনি হবে কে জানে!

প্রথম যে বুনো শুয়োরের পালটা এল, তাদের বেশ স্পষ্টই দেখতে পাওয়া গেল। ওরা দুলে-দুলে দৌড়য় আর ঘোঁত-ঘোঁত শব্দ করে। ঝিলের ধারে গিয়ে চকচক করে খানিকটা জল খেল, আবার দল বেঁধে দুলতে-দুলতে চলে গেল। যেন সময় নষ্ট করতে পারবে না, খুব তাদের জরুরি কাজ আছে।

কাকাবাবু লক্ষ করলেন, শুয়োরগুলো ঢালু দিকটা দিয়েই এল আর গেল।

খানিক বাদেই উঠল পূর্ণিমার চাঁদ। কী স্পষ্ট আর গোল, ঠিক যেন মনে হয় আকাশে একটা ফ্লাড লাইট জ্বালা হয়েছে। কিন্তু ইলেকট্রিক আলোর মতন কড়া নয়, চাঁদের আলো স্নিগ্ধ। তাই তো জ্যোৎস্না নিয়ে এত কবিতা লেখা হয়।

এমন ফটফট করছে জ্যোৎস্না, সব কিছুই যেন পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। লোকে বলে, জ্যোৎস্না রাতে তাজমহল দেখতে যেতে হয়। জ্যোৎস্না রাতে জঙ্গল দেখাও এক নতুন অভিজ্ঞতা। সব কিছুই যেন বদলে গেছে। এর মধ্যে কখন যে গোটা সাতেক হরিণ আর দুটো গণ্ডার এসে গেছে, টেরও পাওয়া যায়নি।

প্রাণী হিসেবে গণ্ডার সত্যিই সুন্দর নয়। ঘোড়া যেমন সুন্দর। হরিণ তো সুন্দর বটেই। হাতি, বাঘ, ভালুক এদেরও নিজস্ব রূপ আছে। গণ্ডারের মুখোনা বিচ্ছিরি। কিন্তু এখন গায়ে জ্যোৎস্না মেখেছে বলে তো তাদের বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে না। এত বড় ভারী একটা জন্তু, কিন্তু হাঁটছে নিঃশব্দে।

অরণ্যের প্রাণীদের মধ্যে যাদের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, তারা ছাড়া কেউ কাউকে নিয়ে মাথা ঘামায় না। হাতির পাশ দিয়ে হরিণ চলে গেলেও হাতি কোনও দিন তাদের মারবে না। হরিণের সঙ্গে শুয়োরের লড়াই হয় না। গণ্ডার তো কারও সাতে-পাঁচেও থাকে না। ওদের ছোট-ছোট চোখ, বিশেষ কিছু দেখতেই পায় না, আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। হাতি তবু কখনও কখনও খেপে গিয়ে মানুষ মারে, কিন্তু গণ্ডার কখনও মানুষ মেরেছে, এমন শোনাই যায় না। ওরা নিরীহ প্রাণী, মানুষের ক্ষতি করে না।

যত নষ্টের গোড়া হচ্ছে বাঘ। যাকে-তাকে মারে। গায়ের জোরে পারবে না বলেই হাতি আর গণ্ডারকে ঘাঁটায় না। মানুষ আরও বেশি হিংস্র, মানুষ হাতির মাংস কিংবা গণ্ডারের মাংস খায় না, তবু ওদের মারে।

হরিণরা জল খেয়ে চলে গেল, রয়ে গেল গণ্ডার দুটো। ওরা জলে নামছে। অন্য সব জন্তরই শীত লাগে, কিন্তু গণ্ডারের শীত নেই। মোষরাও জল ভালবাসে, জলে ডুবে থাকে, কিন্তু তা গরম কালে। অন্য প্রাণীরা জল খেয়ে চলে যাচ্ছে একটু পরে, কিন্তু গণ্ডাররা যাচ্ছে না। শীতকালে ঝিলের জলে অন্য জন্তুরা থাকে না, গণ্ডারই শুধু থাকে, তাও অনেকক্ষণ থাকে, সেই জন্যই শীতকালে গণ্ডার শিকার করা সুবিধেজনক।

ঝিলের উঁচু দিকের পাড়ে এসে দাঁড়িয়েছে দুটো হাতি। আকাশের গায়ে তাদের দেখাচ্ছে ছায়ামূর্তির মতন। হাতি দুটো সেখান থেকে নামার চেষ্টা না করে অনেকখানি ঘুরে চলে এল ঢালু দিকটায়। এদিকে জলের মধ্যে সাতটা গণ্ডার হয়ে গেছে।

অন্য জলাশয়গুলো শুকিয়ে ফেলায় এখানে আসছে অনেকে। একসঙ্গে এত জন্তু-জানোয়ার দেখার সৌভাগ্য অনেকেরই হয় না।

রাত বাড়ছে। কাকাবাবুর সঙ্গে রয়েছে খাবারের প্যাকেট, ফ্লাস্কে গরম কফি, তবু তাঁর কিছু খাওয়ার কথা মনেই নেই। তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন ঝিলের ঢালু দিকটায়। ফেভিকলের বাক্সটা জলে ভাসছে, তাও দেখা যাচ্ছে।

অন্য কোনও মাচা থেকে কেউ একটাও শব্দ করেনি এ পর্যন্ত। শুধু একবার কার যেন খাবারের একটা ঠোঙা পড়েছে নীচে। তাতে অবশ্য কিছু ক্ষতি হয়নি। গাছের শুকনো পাতা বা ফলটলও তো পড়ে!

মাঝরাত্তির পার হওয়ার পর কাকাবাবু ফ্লাস্কের ঢাকনায় কফি ঢেলে একটু-একটু চুমুক দিচ্ছেন, হঠাৎ তিনি একটা ব্যাপার খেয়াল করলেন। হরিণের মতন ছোট প্রাণীরা জল

খেতে-খেতে হঠাৎ মুখ তুলে ঢালু জায়গাটার বাঁ দিকের জঙ্গলের দিকে চেয়ে থাকছে। তারপর তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে দল বেঁধে দৌড়ে পালাচ্ছে।

ওখানে কিছু একটা আছে। বাঘ, কিংবা মানুষ। হিংস্র প্রাণীর উপস্থিতি হরিণই সবচেয়ে আগে টের পায়। মানুষ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। চোরাশিকারিরা এসে গেছে তা হলে! একেবারে নিঃশব্দে কী করে এল? এ-জায়গাটা জঙ্গলের অনেকটা ভেতরে। ওরা গাড়ি কিংবা ঘোড়ায় চেপে এসে, সেগুলো এক জায়গায় রেখে পা টিপে টিপে হেঁটে এসেছে?

যেসব সৈন্য গাছ সেজে দূরে ঘিরে আছেতাদের বলা আছে যে, কেউ ঝিলের দিকে আসতে চাইলে সাড়াশব্দ করবে না। কাকাবাবুর নির্দেশ না পেলে কিছুই করবে না ওরা।

সত্যিই চোরাশিকারিরা এসেছে কি না এখন বোঝা যাচ্ছে না। তবে ছোট-ছোট প্রাণীরা বাঁ দিকটায় তাকিয়ে চঞ্চল হয়ে পালাচ্ছে ঠিকই। বাঘ হলে কি এতক্ষণে একটাও শিকার ধরত না?

রাত ঠিক পৌনে একটায় কোথা থেকে এক টুকরো মেঘ এসে হাজির হল আকাশে। কাকাবাবু প্রমাদ গুনলেন। এই রে, আরও মেঘ এসে যদি চাঁদটা ঢেকে দেয়, তা হলে কিছুই দেখা যাবে না। আজকের এত উদ্যোগ মাটি হয়ে যাবে?

ঠিক তখনই বাঁ দিকের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন মানুষ। সাত-আট জন তো হবেই। সকলের হাতে বন্দুক। তাদের মধ্যে একজনের চেহারা তিনজন মানুষের সমান। এতদূর থেকেও চেনা যায়, সে হিম্মত রাও। পালের গোদা হয়ে সে নিজেও এসেছে।

ওরা সার বেঁধে এগিয়ে আসছে জলের দিকে। একসঙ্গে সবাই মিলে কী করতে চায়? আর ধৈর্য ধরতে পারেনি, ঢালু দিকটা আটকে এক সঙ্গে গুলি চালাবে? যত গুলি খরচ হয় হোক, এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে মারবে?

কাকাবাবু শঙ্কিতভাবে অন্য মাচাগুলোর দিকে তাকালেন। ওরা না ভুল করে কিছু একটা করে বসে!

চোরাশিকারির দলটা একেবারে জলের ধারে চলে এসেছে। উঁচু করেছে রাইফেল। এবার একসঙ্গে গুলি চালাবে।

কাকাবাবু ওভারকোটের পকেট থেকে একটা রিমোট কন্ট্রোল সুইচ বের করে টিপে দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে সেই ভাসমান ফেভিকলের বাক্সটায় দুটো বোমার বিস্ফোরণ হল। শব্দ মানে কী, যেন আকাশ ভেঙে পড়ল, তোলপাড় হয়ে গেল ঝিলের জল।

তারপরই যেন শুরু হয়ে গেল প্রলয়। সমস্ত জন্তুগুলো প্রাণভয়ে আর্তনাদ করে ছুটল দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। হাতি দুটো চিৎকার করে উঠল, জঙ্গলের গাছের সব ঘুমন্ত পাখিরা উড়ে গেল বাসা ছেড়ে। কাকাবাবুর গাছের সঙ্গে বাঁধা ঘোড়াটা লাফাতে লাফাতে দড়ি ছেঁড়ার চেষ্টা করতে লাগল প্রাণপণে।

চোরাশিকারিরা আচমকা সেই সাঙ্ঘাতিক আওয়াজে দিশেহারা হয়ে গিয়ে গুলি চালাতে পারল না। নিজেদের সামলে নেওয়ার আগেই দেখল, গণ্ডার-হাতি-শুয়োরের পাল প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছে তাদের দিকে। পালাবার সময় পেল না, তারা পড়ে গেল ওই জানোয়ারদের সামনে।

হিম্মত রাও অত বড় চেহারা নিয়ে একটা গণ্ডারকে হাত দিয়ে রুখবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গণ্ডারের তুলনায় তার গায়ের জোর কিছুই না। গণ্ডারটা তাকে ঠেলে নিয়ে চলেছে আর হিম্মত রাও চেঁচাচ্ছে, বাঁচাও, বাঁচাও!

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন। এখন আর তাঁর করার কিছু নেই। যারা নিরীহ জন্তুদের শিকার করতে এসেছিল, এখন তারাই জন্তুদের শিকার। হাতির পায়ের চাপে কিংবা

গণ্ডারের ভূঁসোয় মরবে না বাঁচবে, তা ওরাই বুঝবে। যারা এই জানোয়ারদের হাত ছাড়িয়ে কোনওক্রমে পালাতে পারবে, তারা ধরা পড়বে সেনাবাহিনীর হাতে।

ঝিলের ঢালু দিকটা শেষ হওয়ার পর জঙ্গলের মধ্যে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড চলছে। হঠাৎ কাকাবাবু দেখতে পেলেন, একটি কালো পোশাক পরা লম্বা লোক রাইফেল হাতে নিয়ে ছুটে আসছে এদিকে। কাকাবাবু এক পলক তাকিয়েই চিনতে পারলেন টিকেন্দ্রজিৎকে। সঙ্গে-সঙ্গে কাকাবাবুর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল, ওকে পালাতে দেওয়া চলবে না, ওকে কাকাবাবু নিজে শাস্তি দেবেন।

দড়ির সিঁড়িটা ফেলে কাকাবাবু তরতর করে নেমে এলেন নীচে।

কিন্তু তারই মধ্যে টিকেন্দ্রজিৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। ঝিলের দিকটা থেকে সে ছুটে আসছিল, এর মধ্যে কোনও বড় গাছ নেই যে, সে গাছে উঠে পড়বে। তা হলে লোকটা গেল কোথায়? অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, না কাকাবাবু চোখে ভুল দেখেছেন!

তিনি রাইফেলটা উঁচিয়ে চারদিকে মাথা ঘুরিয়ে ওকে খুঁজতে লাগলেন।

যেন মাটি খুঁড়ে হুস করে উঠে এল টিকেন্দ্রজিৎ। ঠিক কাকাবাবুর পেছনে। সামান্য একটু শব্দ পেয়ে কাকাবাবু ঘুরে দাঁড়াবার আগেই টিকেন্দ্রজিৎ তার রাইফেলটা উলটো দিকে ধরে তার বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারল কাকাবাবুর ঘাড়ে।

কাকাবাবু ঝুপ করে পড়ে গেলেন মাটিতে।

টিকেন্দ্রজিৎ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, বারবার বেঁচে যাবে? আমার প্ল্যান নষ্ট করেছ, তোমাকে খতম করে দিয়ে যাব।

আবার সে রাইফেলটা তুলল।

আগের বারের আঘাতটা খুব জোর হয়নি। এবার কাকাবাবুর বাধা দেওয়ার ক্ষমতা নেই, এবার সে তাঁর মাথাটা চুরমার করে দিতে চাইল।

ঠিক তখনই পেছন থেকে টিকেন্দ্রজিতের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল সন্তু। গায়ের জোরে সে পারবে না জেনেই টিকেন্দ্রজিতের চোখ দুটোতে সে আঙুল ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল।

কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎ অসাধারণ ক্ষিপ্র। মাথার ঝাঁকুনি দিয়ে সন্তুকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল সে, একটুর জন্য ভারসাম্য হারিয়ে সন্তুকে নিয়েই পড়ে গেল মাটিতে।

সন্তু চট করে গড়িয়ে গিয়ে টিকেন্দ্রজিতের বুকে চেপে বসে তার গলা টিপে ধরে চিৎকার করল, জোজো, শিগগির সবাইকে ডাক, টিকেন্দ্রজিৎকে ধরেছি!

টিকেন্দ্রজিৎকে কাবু করার ক্ষমতা সন্তুর নেই। সে দু পা তুলে জোরে লাথি কষিয়ে ছিটকে দিল সন্তুকে। স্প্রিংয়ের মতন লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। সন্তুকে কিংবা কাকাবাবুকে আর মারার জন্য জোর না করে সে রাইফেলটা তুলে নিয়ে বিদ্যুতের বেগে ছুটে চলে গেল। আর তাকে দেখা গেল না।

সন্তুই যে এবার কাকাবাবুর প্রাণ বাঁচাল, তা তিনি জানতে পারলেন না। তাঁর জ্ঞান নেই।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে জ্ঞান ফিরে এল তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে বসে বললেন, সে-লোকটা কোথায় গেল? আমি কোথায়?

কাকাবাবুর দু ধারে বসে আছে জোজো আর সন্তু। বড়ঠাকুর দাঁড়িয়ে ছিলেন একটু দূরে। কাছে এসে বললেন, আপনি জেগে উঠেছেন? বাঃ, আর চিন্তার কিছু নেই।

কাকাবাবু বললেন, আমার কী হয়েছিল?

বড়ঠাকুর বললেন, মাথার পেছন দিকে একটা চোট লেগেছে। ঘেঁতলে গেছে খানিকটা, তবে ক্ষত খুব গভীর নয়। আমার কাছে ফার্স্ট এড বক্স ছিল, আমি ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ

করে দিয়েছি। আর ভয়ের কিছু নেই। এদিকে খবর খুব ভাল জানেন তো? একটাও গণ্ডার মারা যায়নি, কিন্তু চোরাশিকারি ধরা পড়েছে সাতজন। এদের মধ্যে তিনজনের হাত-পা ভেঙেছে। হিম্মত রাওয়ের অবস্থাটা যদি দেখতেন! একটা গণ্ডার ওকে টুসো দিয়ে-দিয়ে কতবার যে শূন্যে ছুঁড়ে দিয়েছে তার ঠিক নেই। দুটো পা-ই ফ্র্যাকচার। আর ও কোনওদিন উঠে দাঁড়াতে পারবে কি না সন্দেহ!

কাকাবাবু বললেন, আর টিকেন্দ্রজিৎ?

বড়ঠাকুর বললেন, সে পালিয়েছে। তাকে ধরা গেল না। ও লোকটা যে। অসম্ভব ধূর্ত! তবু সন্তু প্রায় কব্জা করে ফেলেছিল। সন্তুর অসাধারণ সাহস, আপনাকে মারবার পর সন্তু টিকেন্দ্রজিতের গলা টিপে ধরেছিল, আমাদের পৌঁছোতে একটু দেরি হয়ে গেল, সেই ফাঁকে পালাল।

কাকাবাবু আপনমনে বললেন, পালাল!

বড়ঠাকুর বললেন, সে পালিয়েছে বটে, কিন্তু তার দলবল ধরা পড়ে গেছে, আর সে এদিকে মাথা গলাতে সাহস করবে না। আপনার বুদ্ধির জন্য এবারকার মতন অনেক গণ্ডার বেঁচে গেল।

কাকাবাবু মাথায় হাত বুলিয়ে ব্যান্ডেজটা অনুভব করলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, এই জায়গাটা কোথায়?

বড়ঠাকুর বললেন, এটা একটা ওয়াচ টাওয়ার। এই একটা মুশকিল হয়ে গেছে। ওখানে সব মিটিয়ে আমরা এই কজন একটা গাড়িতে আসছিলাম। হঠাৎ গাড়িটা মাঝপথে খারাপ হয়ে গেল। কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছে না। তাই এই ওয়াচ টাওয়ারেই রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে। এখানে কোনও ভয় নেই। রাতও প্রায় শেষ হয়ে এল।

কাকাবাবু শুয়ে আছেন চৌকিদারের খাটিয়ায়। সেটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই বড়ঠাকুর হা-হা করে উঠে বললেন, আপনি বিশ্রাম নিন, উঠবেন না।

কাকাবাবু বললেন, আমার বিশেষ কিছু হয়নি।

সন্তু এতক্ষণ কোনও কথা বলেনি। সে বলল, কাকাবাবু, জোজো স্বীকার করেছে, ও আজ যা দেখেছে, সে রকম আর কখনও দেখেনি। হিম্মত রাওয়ের দৌড়ের দৃশ্যটা ভি ডি ও ক্যামেরায় তুলে রাখা উচিত ছিল!

কাকাবাবু একথায় হাসলেন না। তাকালেনও না ওদের দিকে। মুখোনা উদাসীন। চৌকিদারের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বললেন, টিকেন্দ্রজিৎ পালিয়ে গেল? শুধু ওকেই ধরা গেল না!

বড়ঠাকুর পেছনে আসতে-আসতে বললেন, আপনি আর চিন্তা করবেন। এবার তো পুলিশের দায়িত্ব। পুলিশ ঠিক ওকে ধরে ফেলবে।

কাকাবাবু বললেন, না, পুলিশ ধরতে পারবে না। ও জঙ্গলে লুকিয়ে থাকলে কেউ ওকে ধরতে পারবে না। দু-তিন মাস পরে সবাই এ-ঘটনা ভুলে যাবে। আবার ও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াবে। আর আমি কলকাতায় গিয়ে খাব-দাব, ঘুমোব? আর সব সময় মনে পড়বে, টিকেন্দ্রজিৎ আমাকে দু-দুবার মেরে ফেলার চেষ্টা করেছে, আমাকে অপমান করেছে, তবু আমি তার প্রতিশোধ নিতে পারিনি!

একটু দূরে স্টেশন ওয়াগনটা দাঁড় করানো, তার সামনে একটা ডালা খুলে খুটখাট করছে ড্রাইভার। কাছেই বাঁধা রয়েছে ঘোড়াটা, তার এক পাশে রাইফেল বাঁধা, আর একটি থলি।

কাছে গিয়ে ঘোড়াটার গায়ে দু বার চাপড় মারলেন। রাইফেলটা তুলে নিয়ে দেখলেন গুলি ভরা আছে কি না। তারপর শান্ত অথচ দৃঢ় গলায় বললেন, আমাকেই যেতে হবে

টিকেন্দ্রজিৎকে খুঁজতে। আমি যাচ্ছি। তোমরা এখানে থাকো। তোমরা আমার পেছন-পেছন এসো না, টিকেন্দ্রজিৎকে শাস্তি দিয়ে তার পর আমি ফিরব।

বড়ঠাকুর দারুণ চমকে গিয়ে বললেন, আপনি..এখন...এই অসুস্থ শরীর নিয়ে তাকে খুঁজতে যাবেন? না, না, তা অসম্ভব!

কাকাবাবু বললেন, মোটেই অসম্ভব নয়। আমি টিকেন্দ্রজিৎকে শাস্তি দেব, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। যতক্ষণ না সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করছি, ততক্ষণ আমার ঘুম হবে না!

বড়ঠাকুর বললেন, আপনি কি পাগল হয়েছেন, কাকাবাবু? এইভাবে একা-একা গেলে... টিকেন্দ্রজিৎ তো যে-কোনও জায়গা থেকে লুকিয়ে গুলি করে আপনাকে মেরে ফেলতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, মারুক! হ্যাঁ, আমি পাগল হয়েছি। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারলে আমি বাঁচতেও চাই না। আত্মসম্মান বজায় রাখতে না পারলে বেঁচে থেকে লাভ কী? আমি রাজা রায়চৌধুরী, আমাকে অপমান করে এ-পর্যন্ত আর কেউ পার পায়নি। আমি চললাম।

বড়ঠাকুর বললেন, আপনাকে আমরা এ-অবস্থায় কিছুতেই যেতে দিতে পারি না!

বড়ঠাকুর এগোবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু রাইফেলটা তাঁর দিকে তাক করে বললেন, খবরদার, বাধা দিতে গেলে আমি গুলি চালাব। সত্যি গুলি চালাব।

সন্তু দৌড়ে এসে কাকাবাবুর একটা হাত চেপে ধরে বলল, তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব!

কাকাবাবু হিংস্রভাবে এক ধাক্কা মেরে সন্তুকে ঠেলে দিয়ে ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গি করে বললেন, না, তুই আমার সঙ্গে আসবি না। তুই আমার পেছন-পেছন যদি দৌড়ে আসিস, তোকেও আমি গুলি করব।

তারপর বড়ঠাকুরকে বললেন, এই ছেলেটাকে ধরে রাখুন। ওর কিছু হলে তার দায়িত্ব আপনার! আমি যাচ্ছি। হয় আমি টিকেন্দ্রজিৎকে ধরে নিয়ে আসব, নয় আমি মরব।

তারপর লাফ দিয়ে ঘোড়াটার পিঠে চেপে ছুটিয়ে দিলেন খুব জোরে। প্রায় চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেলেন জঙ্গলে।

বড়ঠাকুর বললেন, মাই গড! মাথায় চোট লাগার ফলে উনি কি সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গেলেন?

জোজো অস্ফুট স্বরে বলল, ইচ্ছামৃত্যু! ইচ্ছামৃত্যু!

১০. বড়ঠাকুরের গাড়ি খারাপ

বড়ঠাকুরের গাড়ি খারাপ, ইচ্ছে থাকলেও তাঁরা কাকাবাবুকে অনুসরণ করতে পারলেন না। কাকাবাবু চলে গেলেন অনেক দূরে।

গভীর অরণ্যের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে তিনি চিৎকার করতে লাগলেন, টিকেন্দ্রজিৎ! টিকেন্দ্রজিৎ! যদি সাহস থাকে সামনে এসো! আমি একলা আছি, ভিতুর মতন লুকিয়ে থেকো না!

জঙ্গলের হিংস্র জানোয়ারের পরোয়া করলেন না, আড়াল থেকে কেউ তাঁকে মেরে ফেলতে পারে, সেকথাও চিন্তা করলেন না। তিনি একই কথা চিকার করে বলতে লাগলেন বারবার।

এখন তাঁকে দেখলে পাগল বলেই মনে হবে।

এত বড় জঙ্গলের কোথায় টিকেন্দ্রজিৎ লুকিয়ে আছে তার ঠিক নেই। এমন কি, সে মণিপুর বা অরুণাচলের দিকেও চলে যেতে পারে। জঙ্গল ছেড়ে লুকোতে পারে পাহাড়ে। তা ছাড়া ডাক শুনতে পেলেই বা সে সামনে আসবে কেন?

এ সব কিছুই কাকাবাবুর মনে পড়ছে না। প্রতিশোধের চিন্তায় তাঁর মাথায় আগুন জ্বলছে। তিনি গলা ফাটিয়ে ডাকলেন, টিকেন্দ্রজিৎ, টিকেন্দ্রজিৎ!

ভোর হয়ে যাওয়ার পরও তিনি ক্লান্ত হলেন না, কিন্তু তাঁর ঘোড়াটা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর নড়তে চায় না।

ঘোড়া থেকে নামলেন কাকাবাবু।

সেটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে তিনি নিজেও একটা গাছে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। পাশে রইল গুলি ভরা রাইফেল।

তাঁর ঘুম ভাঙল ঘোড়াটার লাফাফাফি ও চিঁহিঁ ডাকে।

কাকাবাবু রাইফেলটা তুলে এদিক-ওদিক তাকালেন। ঘোড়াটা কোনও কারণে ভয় পেয়েছে। দু পা উঁচুতে তুলে বাঁধন খুলতে চাইছে।

কাকাবাবু হাঁক দিলেন, টিকেন্দ্রজিৎ! টিকেন্দ্রজিৎ!

সঙ্গে-সঙ্গে সামনের একটা ঝোপ থেকে একটা হলুদ রঙের প্রাণী এক লাফে আর-একটা ঝোপে গিয়ে পড়ল।

বাঘ! এই প্রথম বাঘ দেখা গেল এই জঙ্গলে। যতদূর মনে হয় লেপার্ড, লোকে বলে চিতাবাঘ, কিন্তু আসল চিতাবাঘ অন্যরকম, অনেক লম্বা হয়। এই লেপার্ডগুলো ছোট হলেও খুব হিংস্র। মানুষের মুখোমুখি হতে সাহস পায় না, কিন্তু ঘোড়ার মাংসের ওপর খুব লোভ।

লেপার্ডটা এখনও ঝোপের মধ্যে বসে আছে। মানুষটাকে ডিঙিয়ে কী করে ঘোড়াটাকে খাবে, বোধ হয় সেই কথা ভাবছে। ভাগ্যিস কাকাবাবুর ঘুমের মধ্যে ঘোড়াটার ওপর লাফিয়ে পড়েনি। কাকাবাবু কাচ দুটো আনেননি। ঘোড়াটা মরে গেলে তিনি একেবারে অচল হয়ে যাবেন।

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। ঝোপের আড়ালে বাঘটার মাথা একটু-একটু দেখা যাচ্ছে। তিনি ইচ্ছে করলেই পরপর দুটো গুলি চালিয়ে বাঘটাকে মেরে ফেলতে পারেন। কিন্তু অকারণে প্রাণিহত্যা করতে তাঁর মন চায় না।

তিনি জোরে-জোরে বললেন, এই যাঃ যাঃ! পালা! হরিণ কিংবা খরগোশ ধর না গিয়ে! আমার ঘোড়াটা না হলে তোর চলছে না? যাঃ যাঃ।

বাঘটার তবু নড়বার নাম নেই। অনেকদিন নিশ্চয়ই সে ঘোড়ার মাংস খায়নি।

বাঘটা কিছুতেই যাচ্ছে না দেখে তিনি রাইফেলের ডগাটা আকাশের দিকে তুলে একবার ফায়ার করলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বাঘটা তিড়িং করে এক লাফ দিল, আরও কয়েক লাফে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কাকাবাবু ঘোড়াটার গায়ে হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করলেন। তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, ভয় নেই, ভয় নেই রণজিৎ! আমি যতক্ষণ আছি, তোকে কেউ মারতে পারবে না।

আবার ঘোড়ায় চেপে তিনি সতর্ক দৃষ্টি মেলে এগোতে লাগলেন। মাঝে-মাঝে হাঁক দিতে লাগলেন, টিকেন্দ্রজিৎ! টিকেন্দ্রজিৎ!

তিনি ঠিক করেছেন, যেমন করে হোক, টিকেন্দ্রজিৎকে খুঁজে বের করতেই হবে। তাকে না পেলে তিনি এই জঙ্গল ছেড়ে যাবেন না। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয় হোক!

জঙ্গলের মধ্যে কোথায় তিনি চলে এসেছেন তা বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর কাছে এই জঙ্গলের একটা ম্যাপ ছিল, সেটা তো সঙ্গে আনেননি। এদিকে কোনও ঝিল বা জলাশয় চোখে পড়ছে না, কাল রাতের জায়গা থেকে এটা নিশ্চয়ই অন্য দিকে।

ঘুরতে-ঘুরতে দুপুরবেলা কাকাবাবু এক জায়গায় কয়েকটা কুঁড়ে ঘর দেখতে পেলেন। নতুন উৎসাহ নিয়ে তিনি ছুটে গেলেন সেদিকে।

মোট পাঁচটা ঘর। কিছু হাঁস-মুরগি চরছে, দুটো ঘোড়া একটা মাটির গামলা থেকে খড়-বিচালি চিবোচ্ছে। একটি বুড়ো লোক আপনমনে কাঠ কেটে চলেছে।

কাকাবাবু কাছে গিয়ে বুড়োটিকে নমস্কার জানিয়ে অসমিয়া ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি টিকেন্দ্রজিৎকে চেনো, তাকে কাছাকাছি দেখেছ?

বুড়োটি অবাক হয়ে নিঃশব্দে চেয়ে রইল।

কাকাবাবু আবার বললেন, বেশ লম্বা লোক, কালো রঙের ঘোড়ায় চেপে ঘুরে বেড়ায়, মাথায় টুপি।

একটা ঘর থেকে আর-একজন ছোকরা মতন লোক বেরিয়ে এল। কাকাবাবু তাকেও একই কথা জিজ্ঞেস করলেন।

সে মাথা নেড়ে জানাল যে, না, ওরকম কোনও লোককে তারা চেনে না।

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কুড়ি টাকার নোট বার করে বললেন, আমার ঘোড়াটাকে কিছু খাবার দিতে পারো? পয়সা দেব।

কাকাবাবু নেমে দাঁড়াতেই সেই ছেলেটি ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে গেল।

কাকাবাবু একটা ঘরের দাওয়ায় বসলেন। তাঁর মনে পড়ল, তাঁরও বেশ খিদে পেয়েছে। কাল দুপুরের পর আর কিছু খাওয়া হয়নি।

দু-তিন জন স্ত্রীলোক কাকাবাবুকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখছে। কাকাবাবু তাদের দিকে হাত দিয়ে খাওয়ার ইঙ্গিত করে বললেন, আমায় কিছু খেতে দেবে? তোমাদের ঘরে যা আছে, তাই দাও।

একজন স্ত্রীলোক একটা ছোট বেতের ডালায় করে কিছু মুড়ি আর খানিকটা গুড় নিয়ে এল, কাকাবাবু সেই গুড়-মুড়িই খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন, তারপর ঢকঢক করে একঘটি জল খাওয়ার পর প্রাণটা ঠাণ্ডা হল।

ঘোড়াটাও পেটভরে খেয়ে এসে ফরর ফরর শব্দ করতে লাগল। কাকাবাবু আবার উঠে পড়ে ওই লোকদের বললেন, তোমাদের ধন্যবাদ আর নমস্কার। এখানে টিকেন্দ্রজিৎ যদি আসে, তাকে বোলো, একজন খোঁড়া লোক তাকে খুঁজছে।

আবার শুরু হল জঙ্গল পরিক্রমা। মাঝে-মাঝেই কাকাবাবু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেন, টিকেন্দ্রজিৎ! টিকেন্দ্রজিৎ। যদি মরদ হও ততো বেরিয়ে এসো। আমি একা এসেছি। আর কেউ নেই এখানে!

মাঝে-মাঝে কোনও ঝোপের মধ্যে খচরমচর শব্দ হলে তিনি থেমে যান। মনে হয় যেন টিকেন্দ্রজিৎ তাঁকে অনুসরণ করছে। তারপর দেখা যায়, খরগোশ ছুটে পালাচ্ছে। এক জায়গায় হাতির পাল দেখা গেল, সাতটা বড় আর একটা বাচ্চা হাতি। গণ্ডার এখনও চোখে পড়েনি।

একসময় একটা গোঁ-গোঁ শব্দ শুনে তিনি থেমে গেলেন। একটা গাড়ি আসছে। কাকাবাবু একটা বেশ ঘন ঝোপের আড়ালে চলে গেলেন। মাথাটা নিচু করে থাকলে এখানে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। ঘোড়াটা কোনও শব্দ করলেই হয়।

কাছে আসতে বোঝা গেল, সেটা একটা পুলিশের জিপ। একজন ড্রাইভার ও তিনজন বন্দুকধারী পুলিশ, ওদের মধ্যে সন্তু কিংবা জোজো নেই। ওরা কাকে খুঁজতে এসেছে, টিকেন্দ্রজিৎকে, না কাকাবাবুকে!

কাকাবাবু ঠিক করলেন, ঘোড়াটা যদি শব্দ করে আর জিপটা এই ঝোপের দিকে মুখ ফেরায়, তা হলে তিনি গুলি চালিয়ে জিপটার সামনের আর পেছনের চাকা ফুটো করে দেবেন। তারপর পালাতে অসুবিধে হবে না। তিনি কিছুতেই ধরা দেবেন না ওদের হাতে। তার সঙ্গের থলিতে রাইফেলের অনেকের বুলেট আছে, কোটের পকেটে আছে রিভলভার।

জিপটা এদিকে ফিরলই না, সোজা চলে গেল। কেমন যেন দায়সারা ভাব। এমনভাবে খুঁজলে ওরা সারাজীবনেও টিকেন্দ্রজিৎকে খুঁজে পাবে না।

আবার ঘুরতে-ঘুরতে বিকেলের দিকে কাকাবাবু কিছু বাড়িঘর দেখতে পেলেন। জঙ্গলের মধ্যে এরকম আদিবাসীদের কিছু কিছু বসতি থাকে। এ-জায়গাটা একটু বড়, গোটা পনেরো কুঁড়েঘর রয়েছে একটা গোল উঠোন ঘিরে।

একজন বুড়ো আপনমনে কুড়ল দিয়ে একটা গাছের গুঁড়ি কেটে চ্যালাকাঠ করছে। কাকাবাবু তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, নমস্কার, তুমি টিকেন্দ্রজিৎকে চেনো?

বুড়োটি একটুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে টিকেন্দ্রজিতের বর্ণনা শুনল, তারপর আঙুল তুলে দূরে অন্য একটি লোককে দেখিয়ে দিল। সে-লোকটি একটি খাটিয়ার দড়ি মেরামত করছে। তার পাশেই একটি ঘরের দেওয়ালে একটা হরিণের শিং-সুদ্ধ শুকনো মাথা ঝোলানো রয়েছে।

কাকাবাবুর রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। তা হলে টিকেন্দ্রজিতের সন্ধান পাওয়া গেছে!

সে-লোকটি কিন্তু কোনও পাত্তাই দিল না কাকাবাবুকে। ভুরু কুঁচকে কাকাবাবুকে আপাদমস্তক দেখে বলল, কে টিকেন্দ্রজিৎ? কখনও এনাম শুনিনি। কোনও বাইরের লোক এখানে আসে না।

কাকাবাবু অনেকরকম চেষ্টা করলেন, কিন্তু সে গোঁয়ারের মতন একই কথা বলে যেতে লাগল। এর কাছ থেকে কিছু জানার আশা নেই।

কাছেই কয়েকটি অল্পবয়েসী মেয়ে মাটিতে দাগ কেটে কী যেন খেলছে। কাকাবাবু সেদিকে তাকিয়ে রইলেন একদৃষ্টে। একটি মেয়েকে কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে। এর চেহারাও অন্য মেয়েদের থেকে কিছুটা আলাদা। সে একটা হলুদ রঙের ফ্রক পরে আছে।

কাকাবাবু ঘোড়াটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন, তুমি, তুমি ফিরোজা না?

মেয়েটিও চিনতে পেরেছে কাকাবাবুকে। সে ঘাড় বেঁকিয়ে চুপ করে রইল।

কাকাবাবু এবার সেই গোমড়ামুখো লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, এ-মেয়েটিকে তোমরা কোথায় পেলে? এ তো তোমাদের গ্রামের নয়।

সেখানে আরও অনেকে ভিড় করে দাঁড়াল। সবাই মিলে বলতে লাগল যে, এ মেয়েটি সত্যিই তাদের কারও নয়। একটা লোক এই মেয়েটার হাত-পা বেঁধে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, আর মেয়েটা খুব কাঁদছিল, তখন এ-গ্রামের কয়েকজন লোক সেই চোরটাকে মেরেধরে তাড়িয়ে দিয়েছে। সাত-আট দিন ধরে মেয়েটা এখানেই রয়ে গেছে।

কাকাবাবু বললেন, ওকে ওর বাবা-মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে আসোনি কেন? ওর বাবা-মা কত কষ্ট পাচ্ছে।

ওদের একজন বলল, ও মেয়ে যে কোথায় বাড়ি, কাদের মেয়ে, তা কিছুই বলতে চায় না। আমরা জঙ্গল ছেড়ে বাইরে যাই না, আমরা কী করে পৌঁছে দেব? আপনি নিয়ে যান না ওকে!

কাকাবাবু দোটানার মধ্যে পড়ে গেলেন।

জলিল শেখ তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাঁর মেয়েকে এখানে দেখেও তিনি ফেলে যাবেন কী করে? জলিল শেখ মেয়ের জন্য খুব কাঁদছিল। মেয়েটার মাও নিশ্চয়ই কাঁদছে। কিন্তু এ-মেয়েকে এখন বাড়ি পৌঁছে দিতে গেলে আর টিকেন্দ্রজিতের খোঁজ করা হবে না।

এমনভাবে জঙ্গলে ঘুরে-ঘুরে তিনি কতদিন খুঁজবেন। কখনও কি তাকে পাওয়া যাবে? নাঃ, এরকম ঘুরে আর লাভ নেই। ফিরে যাওয়াই ভাল। অন্যায়ের প্রতিশোধ কিংবা অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার চেয়েও কি উপকারীর ঋণশোধ করা অনেক বড় কাজ নয়?

কাকাবাবু ফিরোজাকে কোলে নিয়ে বললেন, কী রে, দুষ্টু মেয়ে, বাড়ি যাবি?

ফিরোজা নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করল, কাকাবাবু তাকে জোর করে ঘোড়ায় তুলে নিলেন। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে জেনে নিলেন জঙ্গল থেকে বেরোবার রাস্তা কোনদিকে।

ফিরোজা ফুপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কাকাবাবু আদর করে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কী রে ফিরোজা, তোর বাড়িতে যেতে ইচ্ছে করে না কেন?

ফিরোজা বলল, বাবা আমাকে মারে!

কাকাবাবু বললেন, আহা, একদিন মারলেও বাবা তোকে ভালবাসে। মা ভালবাসে না?

ফিরোজা বলল, আমার নিজের মা তো নেই! বাড়িতে অন্য মা।

কাকাবাবু বললেন, তা হলেও ওটা তো তোর নিজের বাড়ি। তুই ইস্কুলে পড়িস না!

ফিরোজা বলল, হ্যাঁ, পড়ি।

কাকাবাবু বললেন, বাঃ এখানে বেশ ইস্কুল ফাঁকি দিয়ে রয়েছিস। বেশ মজা, তাই না? তুই এই গ্রামে এলি কী করে?

ফিরোজা বলল, আমি বাড়ি থেকে পালিয়ে একটা জঙ্গলে বসে ছিলাম। তখন একটা লোক এসে আমার হাত-পা বেঁধে ফেলল–

ওর সঙ্গে গল্প করতে-করতে ধীর গতিতে চলতে লাগলেন কাকাবাবু।

হঠাৎ তাঁর মাথায় সেই পাগলামিটা আবার ফিরে এল। এ তিনি কী করছেন? টিকেন্দ্রজিতের ওপর প্রতিশোধ না নিয়ে ফিরে যাবেন? টিকেন্দ্রজিৎ গোপন জায়গায় বসে হাসবে। একবার লোকালয়ে গিয়ে পড়লে আর তাঁর ফেরা হবে না। কলকাতায় গিয়ে

অনবরত এই কথাটা তার মনে কাঁটার মতন বিঁধবে। এ পর্যন্ত যারাই তাঁর গায়ে হাত দিয়েছে, তাদেরই তিনি শাস্তি দিয়েছেন। টিকেন্দ্রজিৎ জিতে যাবে? এ ব্যর্থতা তিনি মেনে নিতে পারবেন না সারা জীবন।

উত্তেজিতভাবে তিনি বললেন, ফিরোজা, আমার একটা কাজ বাকি আছে। তুই আর দু-একদিন এই আদিবাসীদের সঙ্গে থাকতে পারবি?

ফিরোজা মাথা হেলিয়ে বলল, হ্যাঁ, পারব।

কাকাবাবু এবার খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এলেন গ্রামে। ওরা আবার ভিড় করতেই তিনি একটা একশো টাকার নোট একজন বৃদ্ধকে দিয়ে বললেন, ওকে তোমাদের কাছেই রাখো। আমি ফিরে এসে ওকে নিয়ে যাব। যদি আমি ফিরে না আসি, ওকে জামগুঁড়ি গ্রামের জলিল শেখের বাড়িতে পৌঁছে দিয়ো।

তারপরই আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন উলটো দিকে।

বনে বনে তাঁর চিৎকার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, টিকেন্দ্রজিৎ! টিকেন্দ্রজিৎ!

বিকেল শেষ হয়ে আসছে। একটু পরই রাত্রি নেমে আসবে। এই ঘোর অরণ্যের মধ্যে তিনি কোথায় থাকবেন, কী করে থাকবেন, কোনও চিন্তাই করছেন না। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে, তিনি সারারাতই এইভাবে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ঘুরছেন।

কোথাও পথের চিহ্ন নেই। গাছপালা ঠেলে-ঠেলে তাঁকে এগোতে হচ্ছে। এক-এক জায়গায় জঙ্গল এমনই দুর্ভেদ্য যে, সামনে এগোতে না পেরে ঘুরে যেতে হচ্ছে তাঁকে।

চিৎকার করতে করতে কাকাবাবুর গলা চিরে যাচ্ছে। তিনি ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছেন। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

তাঁর সেই রুদ্রমূর্তি দেখে ভয়ে পালাল একপাল হরিণ। মাথার ওপর দিয়ে ঝটপট করে উড়ে যাচ্ছে পাখি। ঘোড়াটাও ডেকে উঠছে মাঝে-মাঝে, কাকাবাবুর ভ্রূক্ষেপ নেই।

মাঝে-মাঝে হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। ঠিক খেলার মাঠের মতন। আবার কোথাও এত বেশি ঝোপঝাড় আর লতাপাতা যে, দিনের বেলাতেও অন্ধকার হয়ে থাকে। এদিকটায় ছোট-ছোট পাহাড় রয়েছে। পাথরের ফাঁকে বড় বড় সুড়ঙ্গের মতন। লুকোবার কত জায়গা। এসব জায়গা থেকে কাউকে খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব।

কাকাবাবু তবুও খুঁজছেন আর চিৎকার করে ডাকছেন, টিকেন্দ্রজিৎ, টিকেন্দ্রজিৎ! ঝোপঝাড় ঠেলে দেখছেন, পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে ঘুরে-ঘুরে দেখছেন।

একটা ছোট্ট টিলা ঘুরে আসতেই সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তার এক প্রান্তে স্থির হয়ে রয়েছে এক কালো ঘোড়ায় অশ্বারোহী।

কাকাবাবু প্রথমটায় দেখতেই পাননি, ডান দিক বাঁ দিক দেখতে দেখতে আসছিলেন, হঠাৎ সামনের দিকে চোখ পড়তেই তিনি দ্রুত ঘোড়ার রাশ টানলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ রাইফেল তুলে তাক করে আছে।

কাকাবাবুর এক হাতে ঘোড়ার রাশ, এক হাতে রাইফেল। দু হাত দিয়ে না ধরলে ঠিকমতন গুলি চালানো যায় না। টিকেন্দ্রজিৎ একেবারে তৈরি হয়ে রয়েছে, কাকাবাবু রাইফেল তোলার সময় পেলেন না।

টিকেন্দ্রজিৎ গম্ভীরভাবে বলল, তোমার হাতের রাইফেলটা ফেলে দাও রায়চৌধুরী।

রাইফেলটা ফেলার বদলে কাকাবাবু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। টিকেন্দ্রজিৎকে যে শেষ পর্যন্ত দেখতে পাওয়া গেছে, তাতেই তাঁর ক্লান্তি কমে গেল। যাক, আর খুঁজে বেড়াতে হবে না!

টিকেন্দ্রজিৎ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, কী ব্যাপার বলো তো রায়চৌধুরী, তোমার এত মরার শখ কেন? সারাদিন তুমি আমার নাম ধরে চেঁচিয়ে বেড়াচ্ছ! উইপোকা যেমন মরার জন্য আলোর দিকে ছুটে আসে, সেইরকম তুমিও আমার হাতেই মরতে চাও!

কাকাবাবু বললেন, আমি একা এসেছি। সঙ্গে পুলিশ কিংবা আর্মি আনিনি। তোমার সঙ্গে আমার শেষ লড়াইটা বাকি আছে।

টিকেন্দ্রজিৎ হা-হা করে হেসে উঠে বলল, কীসের শেষ লড়াই? এক্ষুনি গুলি করে তোমার মাথা ছাতু করে দিতে পারি, সব শেষ হয়ে যাবে। এর আগে অন্তত পাঁচ বার তোমাকে পেছন থেকে গুলি করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তুমি আমার নাম ধরে এত ডাকছ, তাই আমার কৌতূহল হল। এত আন্তরিকভাবে ডাকলে লোকে ভগবানেরও দেখা পেয়ে যায়, তাই আমি তোমার সামনে এলাম।

কাকাবাবু বললেন, পেছন থেকে গুলি করে কাপুরুষরা। তুমি এক সময় খেলোয়াড় ছিলে। খেলার নিয়ম মানবে না? সাহস থাকে তো সামনাসামনি লড়ে যাও!

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, এটা ছেলেখেলা নয়! তুমি আমাদের অনেক ক্ষতি করে দিয়েছ। বহু টাকার ক্ষতি হয়ে গেল। সামান্য কয়েকটা গণ্ডার মরলে কী ক্ষতি হত? তার বদলে তোমাকে মরতে হবে। আমার মায়াদয়া নেই। তোমাকে এখানে মেরে ফেলে দিয়ে গেলেও পুলিশ কোনও দিন আমাকে ধরতে পারবে না। তুমি রাইফেল তোলার চেষ্টা করলেই আমি গুলি চালাব, তুমি খতম হয়ে যাবে।

কাকাবাবু বললেন, এর আগে অনেকেই আমাকে একথা বলেছে, কিন্তু কেউ তো এ-পর্যন্ত মারতে পারেনি। আমি ম্যাজিক জানি, তাই আমি বারবার বেঁচে যাই। তুমি প্রথম বার টিপ ফসকাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি দু হাতে রাইফেল ধরে নেব। তারপর? তুমি যদি অপ্রস্তুত থাকতে, আমি কিন্তু প্রথমেই তোমাকে গুলি করতাম না। তোমাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছি যখন, তোমাকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দিতাম। যদি পুরুষ মানুষ হও, সামনাসামনি সমানে-সমানে লড়তে এসো।

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, তোমার সঙ্গে সামনাসামনি আমি কী লড়ব? হাতাহাতি?

কাকাবাবু বললেন, রাজি আছি।

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, এ তো আচ্ছা পাগল দেখছি! তুমি একে তো খোঁড়া, তায় প্রায় বুড়ো। তুমি পারবে আমার সঙ্গে? তুমি তো দৌড়তেই পারবে না। আমি দৌড়ে-দৌড়ে তোমার চার পাশে ঘুরব, আমাকে ছুঁতেও পারবে না তুমি। আমি তোমার হাত-পা ছিঁড়ে ফেলব, ঘাড় মুচড়ে দেব। আমার কত শক্তি, জানো না তুমি!

কাকাবাবু বললেন, তুমিও আমার শক্তি জানো না।

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, তলোয়ার ধরতে জানো?

কাকাবাবু বললেন, জানি। জোগাড় করো, তলোয়ার লড়তেও রাজি আছি।

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, একজন খোঁড়া লোকের সঙ্গে তলোয়ার লড়তে হবে? লোকে শুনলে হাসবে। দশ গোনারও সময় পাবে না। তোমার পেট ফুটো করে দেব। আমি ফেসিং চ্যাম্পিয়ান।

কাকাবাবু বললেন, তোমার মতো চ্যাম্পিয়ান আমি ঢের দেখেছি। আমার একটা পা-ই তোমার সঙ্গে লড়ার জন্য যথেষ্ট! তলোয়ার যখন নেই, তখন ডুয়েল লড়ো!

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, ডুয়েল? হা-হা-হা-হা! তুমি জানো না, একজন পুলিশ কমিশনার আমার নাম দিয়েছে ফাস্টেস্ট গান অ্যালাইভ। তুমি চোখের পলক ফেলবার আগে আমি গুলি চালাতে পারি। তুমি মরবে, মরবে রায়চৌধুরী। তোমার আর নিস্তার নেই।

কাকাবাবু বললেন, ডুয়েল লড়তে গিয়ে মৃত্যু অনেক সম্মানজনক। তুমি যদি মরো, তা হলে লোকে অন্তত এইটুকু বলবে যে, তুমি বীরের মতন মরেছ।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ে টিকেন্দ্রজিৎ বলল, ঠিক আছে, চুকিয়ে ফেলা যাক। আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

কাকাবাবুও নেমে পড়ে বললেন, রাইফেল, না রিভলভার?

টিকেন্দ্রজিৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, যেটা ইচ্ছে, দুটোই আমার কাছে সমান।

কাকাবাবু বললেন, তবু তোমাকে আমি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিচ্ছি। তুমি কোনটা চাও?

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, ঠিক আছে, রিভলভার। দুজনেই রাইফেল নামিয়ে রেখে রিভলভার বের করল।

কাকাবাবু বললেন, আমরা দুজনে উলটো দিকে ঠিক কুড়ি পা হেঁটে যাব।

টিকেন্দ্রজিৎ বলল, তারপর অন্য একজনের দশ গোনার কথা। এখানে কে গুনবে।

দুজনে দুদিকে গিয়ে দাড়াল। টিকেন্দ্রজিৎ বীরের মতন বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে। কাকাবাবু খোঁড়া পায়ে সোজা হয়ে দাড়াতে পারছেন না, একটু ঝুঁকে আছেন।

টিকেন্দ্রজিৎ গুনল, এক...

কাকাবাবু বাঁ হাত দিয়ে মুখটা মুছে নিলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ গুনল, দুই, তিন, চার, পাঁচ...

কাকাবাবুর রিভলভার সমেত ডান হাতটা নীচের দিকে নামানো।

টিকেন্দ্রজিৎ গুনল, ছয়, সাত, আট, নয়..

কাকাবাবুর কোনও উত্তেজনা নেই।

তিনি সোজা চেয়ে আছেন তার প্রতিপক্ষের দিকে।

টিকেন্দ্রজিৎ দশ বলেই কায়দা করে লাফিয়ে উঠল শুন্যে। বলল, তুমি মারো! পরপর তিনটি গুলির শব্দ হল।

টিকেন্দ্রজিৎ ঝুপ করে নেমে এল মাটিতে। ওদিকে কাকাবাবুও মাটিতে পড়ে আছেন উপুড় হয়ে।

প্রথমে টিকেন্দ্রজিৎ কাতর শব্দ করে উঠল, আঃ!

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে উঠে বসলেন। তারপর এক পায়ে লাফাতে-লাফাতে চলে এলেন টিকেন্দ্রজিতের কাছে। টিকেন্দ্রজিৎ যন্ত্রণায় মাটিতে গড়াতে শুরু করেছে। তার ডান হাত ও ডান পায়ের হাঁটুর কাছটা রক্তে মাখা। রিভলভারটা ছিটকে পড়ে গেছে অনেক দূরে।

টিকেন্দ্রজিৎ কাতরভাবে বলতে লাগল, আমার আঙুল, আমার বুড়ো আঙুলটা নেই। আর কোনও দিন আমি অস্ত্র ধরতে পারব না। আমার হাঁটু, হাঁটু ভেঙে গেছে। আমি আর বাঁচতে চাই না। রায়চৌধুরী, তুমি আর-একবার গুলি করে আমায় মেরে ফেলো।

কাকাবাবু বললেন, আমি মানুষ মারি না। জীবনে একটাও লোককে মেরে ফেলিনি! তোমাকে শাস্তি দেওয়ার কথা ছিল, শাস্তি দিয়েছি। তুমি আমার চুলের মুঠি ধরেছিলে। জীবনে আর কোনও কিছুই মুঠোয় চেপে ধরতে পারবে না। ডান পায়ে লাথি মেরেছিলে, আর কোনও দিন কাউকে লাথি মারতে পারবে না।

টিকেন্দ্রজিৎ আবার বলল, আমায় মেরে ফেলো। এই অবস্থায় আমি কিছুতেই বাঁচতে চাই না।

কাকাবাবু বললেন, তোমাকে খুঁজে না পেয়ে আমি আত্মহত্যা করার জন্য তৈরি ছিলাম। আত্মসম্মান বজায় রাখতে না পারলে বেঁচে থাকাটাই বিড়ম্বনা। তুমি লোককে ভয় দেখিয়ে

চলতে। এখন আর তোমায় কেউ ভয় পাবে না, এটাই তোমার শাস্তি। আমার আর-একটা কাজ বাকি আছে।

টিকেন্দ্রজিৎ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, আমি আর কথা বলতে পারছি না। রায়চৌধুরী, দয়া করে কাছে এসো, আমার মাকে শুধু একটা কথা জানাতে হবে।

কাকাবাবু কাছে এসে মুখ ঝুঁকিয়ে দাড়াতেই টিকেন্দ্রজিৎ তার অক্ষত বাঁ হাতটা দিয়ে কাকাবাবুর একটা পা ধরে হ্যাচকা টান দিল। কাকাবাবু ধড়াম করে পড়ে গেলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ তার রক্তমাখা শরীর নিয়ে কাকাবাবুর বুকে চেপে হিংস্র গলায় বলল, আমি মরব, তার আগে তোমাকেও শেষ করে যাব।

সে কাকাবাবুর গলা চেপে ধরলেও তিনি ঘাবড়ালেন না। টিকেন্দ্রজিতের গায়ে যতই জোর থাক সে একহাতে কাকাবাবুকে কাবু করতে পারবে না। কাকাবাবু কোনওক্রমে ডান হাত তুলে একটা প্রচণ্ড ঘুসি কষালেন তার এক চোখে। তারপর তাকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন বুক থেকে।

চোখের ব্যথায় আরও জোর ছটফট করতে লাগল টিকেন্দ্রজিৎ।

কাকাবাবু হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসে বললেন, একটা কাজ বাকি আছে।

টিকেন্দ্রজিতের কোটের পকেট হাতড়ে পেয়ে গেলেন লাইটার ও চুরুট। বহুদিন পর চুরুট ধরাবার জন্য তিনি কাশলেন দু বার। মুখ বিকৃত করে বললেন, ভাল লাগছে না।

চুরুটের মুখটা যখন লাল গনগনে হল, তখন কাকাবাবু সেটা চেপে ধরলেন টিকেন্দ্রজিতের বুকে।

টিকেন্দ্রজিৎ আঁ-আঁ করে বিকট আর্তনাদ করে উঠল।

কাকাবাবু বললেন, অন্য লোককে যখন কষ্ট দাও, তখন মনে থাকে না যে, নিজের শরীরে কষ্টটা কেমন লাগে?

টিকেন্দ্রজিতের গলায় একটা সরু লোহার চেনে একটা বাঘের মুখের ছবিওয়ালা লকেট ঝুলছে। কাকাবাবু একটানে সেটা ছিঁড়ে নিয়ে বললেন, এটা আর তোমাকে এখন মানায় না। তুমি এখন একটা শেয়াল।

উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, আমাকে তুমি জঙ্গলে ফেলে রেখে গিয়েছিলে, তোমাকেও ফেলে রেখে গেলাম। হয় জন্তু-জানোয়ারের হাতে মরবে, কিংবা যদি কেউ বাঁচাতে আসে, ভাগ্যে যদি থাকে, তা হলে বাঁচবে।

টিকেন্দ্রজিতের ঘোড়াটাকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে, নিজের ঘোড়ায় চেপে কাকাবাবু ফিরে এলেন আদিবাসীদের গ্রামে। ফিরোজাকে তুলে নেওয়ার পর তিনি গ্রামের সেই গোমড়ামুখো লোকটাকে বললেন, টিকেন্দ্রজিৎ নামে একজন লোক ওইদিকে জঙ্গলে আহত হয়ে পড়ে আছে। চিকিৎসা করলে এখনও সে বাঁচতে পারে। দ্যাখো, তাকে বাঁচাতে পারে কি না?

ফিরোজাকে তার গ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দিতে রাত ভোর হয়ে গেল। সেবাড়িতে কাকাবাবু বিশ্রাম নিলেন খানিকক্ষণ। তারপর বাংলোয় যখন ফিরে এলেন, তখন সকাল নটা বাজে।

সন্তু, জোজোরাও ফিরেছে একটু আগে। সারারাত তারা খোঁজাখুঁজি করেছে জঙ্গলে। তিনটি সার্চ পার্টি ঘুরেছে বিভিন্ন দিকে। হতাশ হয়ে ফিরে এসে সবেমাত্র তারা একটু ঘুমোবার আয়োজন করছে, এমন সময় বাগানে ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে ছুটে এল বারান্দায়।

ঘোড়া থেকে নেমে সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে উঠতে কাকাবাবু বললেন, আমার ক্রাচ দুটো এনেছিস তো রে! চা-টা বানাতে বল। আজ ভাল করে ব্রেকফাস্ট খাব।

কাকাবাবুর শরীরে একটুও ক্লান্তির চিহ্ন নেই। চোখমুখ উজ্জ্বল, ঠোঁটে সেই স্বাভাবিক হাসি। তিনি একটা ইজিচেয়ারে বসলেন।

সন্তু, জোজো দুজনে একসঙ্গে নানা প্রশ্ন শুরু করতেই কাকাবাবু হাত তুলে ওদের থামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, সব ঘটনাটা বলার আগে তোদের একটা জিনিস দেখাই। রূপকথার গল্পে পড়েছিস তো, রাজকুমার গিয়েছিল এক দৈত্যের সঙ্গে লড়াই করতে, পাহাড়ের গুহায়। দারুণ যুদ্ধের পর তো দৈত্যকে হারিয়ে দিল রাজকুমার। কিন্তু রাজধানীতে ফিরে প্রমাণ দিতে হবে তো। সেইজন্য রাজকুমার দৈত্যের মস্ত বড় জিভটা কেটে এনেছিল। আমিও একটা জিনিস এনেছি।

কাকাবাবু কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মুঠো করে কিছু তুলে আনলেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী প্রমাণ এনেছি বল তো?

কোনও উত্তর না দিয়ে ওরা দুজন উৎসুকভাবে চেয়ে রইল।

কাকাবাবু মুঠো খুলে দেখালেন। টিকেন্দ্রজিতের গলার সেই বাঘমুখো ছবিওয়ালা লকেট!